Vol. 36 | No. 1 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ: 'কল্পনা' থেকে 'শিশু'

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.1
Pages	১-88
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ: 'কল্পনা' থেকে 'শিশু'

সৈয়দ আলী আহসান

কল্পনা

একজন কবির কবি-কল্পনা যে কত বিচিত্র পথে অগ্রসর হয় তা বলা কঠিন। বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র অভিসারে তার যাত্রা। দীর্ঘ কবি-জীবন ছিল রবীন্দ্রনাথের। এই দীর্ঘ কবি-জীবনে অন্তর্মুখীনতা এবং বহির্মুখীনতা উভয় প্রকার আবেগ তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এক সময় বাইরের পৃথিবী এবং সমাজ তাঁকে যে বাস্তব প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই একই সময়ে আবার তিনি স্বপ্নের জগৎ নির্মাণ করতে চেয়েছেন এবং কালিদাসের যুগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কল্পনা প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি আপন কবি-চৈতন্যকে বিহঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলছেন যে, বাস্তবের রূঢ়তার ঊর্ধ্বে উঠে কল্পনার জগতে উড়ে যাবার বাসনা কবির। বিহঙ্গ যেমন দূরের পথে পক্ষ বিস্তার করে যে পথ সম্পর্কে সে সুস্পষ্ট কিছু জানেনা, কবিও তেমনি কল্পনার একটি আভাময় জগৎ নির্মাণ করতে চাচ্ছেন যে জগতের সাথে তাঁর পরিচয় নেই। *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার উদার ক্ষেত্রের জন্য কালিদাসকে বেছে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব ছিল প্রচুর এবং প্রবল। কবি কালিদাসের প্রভাবটিই সর্বাপেক্ষা প্রবল। *প্রাচীন সাহিত্য* নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাবের মুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। 'মেঘদূত' নামক প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের কথা স্মরণ করেছেন যে ভারতের সঙ্গে আধুনিক মানুষের নির্বাসন ঘটেছে। সেখানকার সব কিছুই কবির কাছে মধুর, আনন্দময় এবং আবেগময় মনে হয়েছে। সেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া, বর্ষার

সমাগমে পাখীদের ব্যস্ততা, গ্রাম্য বৃদ্ধদের গল্প বলা, সব কটি দৃশ্য কবিকে আবেগে উদ্বেলিত করেছে। তিনি যে কালিদাসের প্রাচীন ভারতের বিপুল শ্রম ও বহুল ঐশ্বর্যের দ্বারাই অভিভূত হয়েছেন তাই নয়, তিনি সেই যুগের সৌন্দর্য, আনন্দ এবং প্রণয়কুশলতায়ও বিহ্বল হয়েছেন। সেই প্রাচীন ভারতের নদী-গিরি, নগরীর নামগুলোও কবির কাছে শ্রুতিমধুর মনে হয়েছে। শ্রোত্ররসায়ন এই নামগুলো রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, ছন্দে এবং সুরে এমনভাবে উপস্থিত যে তার মধ্যে একটি শোভা, সম্ভ্রম এবং শূন্যতা বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় আমরা আবিষ্কার করি যে কবি সেই প্রাচীন ভারতে তাঁর কল্পনাকে পাঠাতে চেয়েছেন। যেহেতু সেখানে সহজে উপনীত হবার জন্য কোন পথ নেই, তিনি ভাষায়, ভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে, ভুল-ভ্রান্তিতে, আলো-আঁধারে, কালিদাসের কালের ভারতবর্ষের একটুখানি আলো এবং বাতাস পেতে চেয়েছেন। যেহেতু সে-যুগকে তিনি কখনও সম্পূর্ণ করে পাবেন না তাই কল্পনায় সে যুগের নতুন চিত্ররূপ নির্মাণ করেই তিনি আনন্দিত।

কালিদাস প্রধানত সৌন্দর্যের কবি। এই সৌন্দর্য বস্তুর বহিরঙ্গের সমৃদ্ধির, মানব দেহের যৌবনের এবং রসাস্বাদের পরিপূর্ণতার। *মেঘদূত* কাব্যে কবি বিভিন্ন চরণে বিভিন্ন ঘটনার অথবা বস্তুর দর্শনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন 'পূর্বমেঘ'-এর আরম্ভে বলছেন—আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে মেঘ গিরশৃংগকে আলিঙ্গন করেছে এবং মেঘগুলোকে বপ্রক্রীড়াপরায়ণ হস্তীর ন্যায় সুদৃশ্য মনে হচ্ছে। অন্যত্র বলছেন—পদ্মরাগ প্রভৃতি উজ্জ্বল মণি-মাণিক্যের প্রভা একত্রিত হলে যেরূপ মনোহর দেখায় সেই প্রকার সুদর্শন মনে হচ্ছে ইন্দ্রধনুকে। মেঘের সর্বাঙ্গ ইন্দ্রধনুর স্পর্শে সমুজ্জ্বল দীপ্তি পেয়েছে। আরও বলছেন—মেঘ যখন পর্বতশৃঙ্গের উপরে আরোহণ করবে তখন সেই পর্বত ত্রিদশমিথুনের নয়নরঞ্জন হবে। এভাবে আমরা বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে পারি যে, *মেঘদূত* কাব্যে কালিদাসের উদ্দেশ্য ছিল সকল নয়না-ভিরাম দৃশ্য পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। কবি মেঘের যাত্রা পথে বিভিন্ন সুদৃশ্যের অবতারণা করেছেন এবং সৌভাগ্য দ্বারা সমস্ত প্রকৃতিকে বরণীয় ও রমণীয় করেছেন। তিনি যখন প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন তখন সে চিত্রে আমরা সজীব এবং সজল পৃথিবীকে লক্ষ করেছি, যখন পর্বতের কথা বলেছেন তখন সে পর্বতকে পরিপক্ব ফল-কুসুমে মণ্ডিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। যখন অরণ্যাকীর্ণ ভূমির কথা বলেছেন তখন সেই ভূখণ্ডের মধ্যে পা চলার পথে পথিক যে সুগন্ধ আঘ্রাণ করবে সে কথা বলতে ভোলেননি। সমগ্র *মেঘদূত*-এ আমরা দেখব অসংখ্য তারকারাজির মত

চর্তুদিকে ফুল ফুটে আছে, কোথাও প্রস্ফুটিত পুষ্প, কোথাও ভূমিকদম্বের প্রথম উৎপন্ন মুকুল, কোথাও পদ্ম, হরিৎ কপিস বর্ণের স্থল-কদম্ব, কোথাও যুঁথিকার মুকুল, এভাবে কবি সর্বত্র একটা শোভন সৌন্দর্য ছড়িয়েছেন। এ সমস্ত কিছুই আমাদের নয়নের কাছে গ্রাহ্য এবং সে কারণে নয়নাভিরাম। দেখা যাবে যে কালিদাস একটা বিপুল সমৃদ্ধির যুগে বাস করতেন। সেই সমৃদ্ধির স্বাক্ষর তাঁর প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে চিত্রিত হয়ে আছে। সুতরাং কালিদাসের সৌন্দর্য বর্ণনায় আমরা বিপুল ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তাঁর কালে অবিকল এই সৌন্দর্যকে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না বলেই তিনি বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং সে সৌন্দর্যকে স্বপ্নে হোক, কল্পনায় হোক ক্ষণকালের জন্য অনুভব করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করেছেন। পার্থক্য এখানে যে রবীন্দ্রনাথ যখন কালিদাসের জগৎ এবং জীবনকে নতুন করে নির্মাণ করবার চেষ্টা করেছেন তখন তাকে শুধু পুরনো কাহিনী স্মরণ করতে হয়েছে এবং বাস্তবের সঙ্গে প্রচণ্ড অভিঘাতের পরিচয়ও আনতে হয়েছে, কেননা রবীন্দ্রনাথ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি নন, তিনি বৈজ্ঞানিক জগতের মানুষ। প্রাচীন ভারতের যে শাশ্বত সুকুমার জীবন কালিদাসের রূপরেখায় ধরা পড়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সে যুগের সৌন্দর্য। কবি কালিদাসের সিদ্ধি এখানেই যে তিনি উপমা-অলঙ্কারে, ছন্দের লালিত্যে এবং শব্দের মাধুর্যে একটি তৃপ্তি এবং পূর্ণতাকে উদঘাটিত করেছেন, যে পূর্ণতার একটি লালিত্য, মাধুর্য এবং স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে।

কালিদাস এমন একটি জগৎ নির্মাণ করেছিলেন যে জগৎ চির-শ্যামল, চির-মধুর এবং বেদনারহিত হাস্যময়। রবীন্দ্রনাথ সে-জগতের আংশিক ভাবানুষঙ্গ *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে চিত্রিত করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে কালিদাসের সৌন্দর্যের প্রতি কবির আকর্ষণের অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং অনেকস্থলে সে সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে সে-জগতের সঙ্গে তাঁর যুগের দুস্তর ব্যবধান। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিতে নবযৌবনে বর্ষার যে বর্ণনা আমরা পাই সে বর্ণনা বাস্তব বিবেচনায় অপ্রাকৃত, কিন্তু কালিদাসের সমৃদ্ধির অনুষঙ্গে তা মধুর ও আকর্ষণীয়, যেমন এই অংশটি—

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা
জনপদবধূ তড়িৎচকিতনয়না
মালতীমালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,

ললিত নৃত্যে বাড়ুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!
আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, উলুরব করো বধূরা
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী
ওগো প্রিয় সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটিরে, ওয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী!
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী!

এখানকার বর্ণনাটি দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় অপূর্ব। কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের বর্ণনা থেকে অনেকগুলো চিত্র এখানে নির্মাণ করেছেন। একাকার হয়ে সবকটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেউ শঙ্খ বাজাচ্ছে, বধূরা উলু দিচ্ছে, কুঞ্জকুটিরে কোন রমণী ভাবাকুল নয়নে বসে আছে, ভূর্জ পাতায় কেউ লেখা লিখছে, কেউ আবার অঙ্গ প্রসাধন করছে, আবার কেউ তালি দিয়ে ভবনশিখীরে নাচাবার চেষ্টা করছে। সবকটি দৃশ্যেরই আবেদন নয়নের কাছে এবং তা সম্ভব হয়েছে কালিদাসের কাব্য থেকে শব্দ, অলঙ্কার এবং দৃশ্যপট ব্যবহার করায়।

কল্পনা-র তৃতীয় কবিতা 'চৌরপঞ্চাশিকা'। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র মূল কাহিনীটি কাশ্মিরী কবি বিলহনের। বিলহন সম্পর্কে রাহুল সাংকৃত্যয়ন তাঁর *সংস্কৃত কাব্যধারা* গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। *বিলহনচরিত* কাব্যে গুজরাটের রাজা বীরসিংহের কন্যা শশীকলার সঙ্গে কবির প্রেমের বর্ণনা আছে। বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ তাঁদের নিজ নিজ *বিদ্যাসুন্দর কাব্যে* বিলহনের কয়েকটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বাঙালি কবিদের কবিতা থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতার নায়িকার নাম 'বিদ্যা', 'শশীকলা' নয়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় প্রাচীন প্রেমকাহিনীকে স্মরণ করেছেন মমতার সঙ্গে। কবি এ কবিতায় স্বপ্নপ্রয়াণ করে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন অঙ্গনে পদচারণা করেছেন।

'স্বপ্ন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগের চিত্রাঙ্কণ সম্পূর্ণ করে বর্তমানকালের মানুষ হিসেবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে সেই যুগের অপূর্ব প্রহরগুলির সঙ্গে বর্তমান মানুষের মৈত্রী নেই—

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে-মোর হস্তে হস্ত রাখি

নীরবে শুধালে শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু আছো তো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দু'জনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর।
দু'জনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

কালিদাসের কাব্যসৌন্দর্যের প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কালিদাস তাঁর যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে সে যুগের যে সমৃদ্ধি এবং আনন্দের মধ্যে তিনি বাস করতেন তার পরিচয়ও তার শব্দে, উপমায়, অলংকারে এবং ধ্বনি মাধুর্যে বহমান হয়েছে। সেই কারণে কালিদাসের কাব্যের বিবিধ অলংকৃত উল্লাস চিত্রগুলো তাঁর যুগের সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং তাঁর কালের সঙ্গে একাত্ম। অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্য নির্মাণ করেছেন তা স্মৃতির অট্টালিকা। তিনি যে চিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন সেই চিত্রগুলো কালিদাসের কাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। সেইসব চিত্রের বাস্তব স্থিতি কোথাও নেই। এ কারণে বারবার তাঁকে সচকিত হতে হয়েছে এবং বলতে হয়েছে যে কালিদাসের যুগের সঙ্গে তাঁর যুগের একটি সহজ সংলাপগত মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। একটি হচ্ছে 'মদনভস্মের পূর্বে' আর একটি হচ্ছে 'মদনভস্মের পরে'। 'মদনভস্মের পূর্বে' কবিতায় যে রসাবেশ তা হচ্ছে কালিদাসের কাব্যের এবং 'মদনভস্মের পরে' কবিতাটির রসাবেশ রবীন্দ্রনাথের কালে। প্রথম কবিতাটিতে একটি সমৃদ্ধমান সম্ভোগের বর্ণনা, যেখানে প্রেম একটি উল্লাসময় আচরণ মাত্র, যেখানে সজীব দেহের আকাঙ্ক্ষা সমর্থিত হয়েছে। 'মদনভস্মের পরে' কবিতায় প্রেম হচ্ছে একটি হৃদয়বৃত্তি যেখানে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে, অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা আছে এবং নিগূঢ়ভাবে প্রণয় নিবেদনের মধ্যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা আছে। এ হৃদয়বৃত্তি রোমান্টিক রসাবেশের পরিচয় বহন করে। *কল্পনা*-য় রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ নির্মাণ করেছেন সেজগৎ যে আকাশকুসুম, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। 'বেহাগে' রচিত একটি গানে তিনি বলছেন—

আমি কেবলি স্বপন করছি বপন
বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।

ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী
মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।

কবি কালিদাসের চিত্র নির্মাণ পদ্ধতিতে লক্ষ করি যে কবি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে, যৌবনের আবেগে দীপ্ত করে এবং বিভিন্ন কর্মচাঞ্চল্যে উপস্থাপিত করে চিত্রগুলোকে সার্থক করেছেন। এসব কারণে কালিদাসের ছবিগুলোকে কখনও অবাস্তব মনে হয় না। পুষ্পনিকুঞ্জে একটি যৌবনবতী রমণী অত্যন্ত স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক যৌবনময় দেহ নিয়ে কারও অগ্রসরমানতা। কবি কালিদাস শুধুমাত্র একটি বস্তুকে দৃশ্যগোচর করেই ক্ষান্ত হননি, বস্তুকে সঙ্গে সঙ্গে সবল এবং সজীব করেছেন। সেই কারণে কালিদাসের কোন চিত্রকে আমরা অবাস্তব বলে স্বীকার করতে পারিনে। *রঘুবংশ*-এর চিত্রগুলো পরীক্ষা করলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে কবি কালিদাস যে সময়কালের জীবন ইতিহাস নির্মাণ করেছেন, তিনি তাঁর শব্দে এবং ছন্দে সেই জীবন ইতিহাসকে বাস্তবরূপে হিল্লোলিত রেখেছেন। এহেন সফলতা সম্ভবপর হয়েছে শুধুমাত্র কবির গভীর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতার চিত্রকে উপস্থাপিত করবার আগ্রহের জন্য এবং কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যকে সুগভীর সত্যরূপে চূড়ান্ত মূল্য দেবার জন্য। কালিদাসের কোন চিত্রই অসম্পূর্ণ নয়। যেখানে রমণীকুল রাজকুমারকে দেখবার আগ্রহে গবাক্ষ-সান্নিধ্যে যাত্রা করেছে সেখানকার দৃশ্যটিও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ। আমরা বিভিন্ন রমণীর গমন-ভঙ্গির মধ্যে একটি ঔৎসুক্য, আগ্রহ, কৌতূহল এবং কামনা রেখাঙ্কিত হতে দেখি। প্রতিটি রমণী সমগ্র চিত্রের অংশবিশেষ এবং সকলে মিলে চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা কালিদাসের এই সম্পূর্ণতাকে পাই না, সেখানে অসম্পূর্ণতাই সকল আবেগের পরিণাম। 'স্বপ্ন' কবিতাটি, 'স্পর্ধা' কবিতাটি, 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটি—সব কয়টিই অসম্পূর্ণতার বেদনাকে ধারণ করে আছে। কালিদাসের পক্ষে চিত্রগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ সম্ভবপর ছিল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের নির্ভরতা হচ্ছে কালিদাসের উপর এবং কালিদাসকে তিনি অনুসরণ করছেন না, কালিদাসকে তিনি স্মরণ করছেন। এভাবে স্মরণ করতে যেয়ে কালিদাসের কালকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছেন না এবং না পাওয়ার কারণেই তাঁর বেদনা এবং যন্ত্রণা। এই মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা চিন্তা করলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে অবাস্তব যেমন বলব আবার সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তবতার পূর্ণ স্বীকৃতির

ক্ষেত্রে কবির ব্যর্থতাকে তেমনি প্রশংসা করব। এক কথায় বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি আধুনিক কবিমন সজাগ রয়েছে যে মন একটি অনাবিল নিশ্চিন্ততায় প্রাচীন যুগকে স্মৃতি-কক্ষে পেতে চায় কিন্তু তা যে পাওয়া যায় না সে সম্পর্কে সে অবহিত।

কল্পনা-র 'স্বপ্ন' কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো কল্পনার এমনি একটি আশ্লেষে আচ্ছন্ন যে সৌন্দর্য এবং সুষমায় তা অলৌকিক এবং পরিচিত জীবনধারার সাথে সম্পর্কবিহীন। ছন্দ ও অনুপ্রাসের ব্যবহারে এবং কালিদাসের কাব্য থেকে সংকলিত বিভিন্ন বিশেষ্যের প্রয়োগে 'স্বপ্ন' কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক হারিয়েছে। এখানে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক কোন চিত্রে ধরা পড়েনি অথবা ছন্দে ও ধ্বনিতে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে কবি-চিত্তের একটি ইচ্ছার অভিব্যক্তিতে। কবি প্রাচীনকালের দয়িতাকে একান্তভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু দেখা গেল ভাষাগত এবং কালগত ব্যবধান থেকে তাকে নিবিড় করে পাওয়া সম্ভবপর নয়। এই বেদনাবোধের কারণে এই কবিতা বর্তমান মুহূর্তের সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সম্পর্কিত এবং সে কারণে কবিতাটি গ্রহণযোগ্যও হয়েছে। *কল্পনা*-র অন্য একটি কবিতা 'ভ্রষ্টলগ্ন'। এ কবিতাটিতে যে সমস্ত চিত্রপট উন্মোচিত হয়েছে তার মধ্যে বাস্তবতার সাড়া নেই এবং কবি পূর্বের মতই এখানে বিচিত্র ধ্বনি-ব্যঞ্জনার অনুপ্রাসে এবং কালিদাসের কাব্য সম্পর্কিত রূপকল্পের ব্যবহারে একটি ছন্দের তন্ময়তা সৃষ্টি করেছেন। আমার ব্যক্তব্য হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালিদাসের প্রভাব আছে কিন্তু সে প্রভাবটুকু কোন সমগ্রতার সৃষ্টি করেনি। কালিদাসের প্রতিটি কাব্য যে অর্থে পূর্ণাঙ্গ, কালিদাসের প্রভাবযুক্ত রবীন্দ্রাথের কবিতাগুলো সেই অর্থে পূর্ণাঙ্গ নয়। এখানে অসম্পূর্ণতাতেই কবিতাগুলোর লীলাময় মাধুর্য।

কল্পনা কাব্যগ্রন্থে অলংকার নির্বাচন ও শব্দ চয়নে বিশিষ্টার্থক সিদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের পরিচয়-লিপিকে নতুন ব্যঞ্জনায় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। দু'একটি ক্ষেত্রে কালিদাসের প্রতিচিত্রণ নেই, কিন্তু সমান্তরাল ব্যঞ্জনা আছে। যেমন 'পিয়াসী' কবিতাটি। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছেন যাকে কালিদাসের *শকুন্তলা* নাটকের আশ্রয়-প্রতিবেশের শ্রী ও শোভার সঙ্গে তুলনা করা চলে, অথচ এখানকার উন্মোচিত চিত্রটি বাংলাদেশের পল্লীর প্রাতঃকালের। সমান্তরাল ব্যঞ্জনার কারণে কবিতাটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এই সমান্তরাল ব্যঞ্জনা 'পসারিণী' কবিতাটিতেও আছে।

কল্পনা কাব্যগ্রন্থে 'স্পর্ধা' নামক কবিতাটি পদাবলীর শ্রীরাধিকার রসোদ্গার-বিষয়ক পদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। জ্ঞানদাসের একটি পদে আছে:

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে।
করে কর করি ফয়ল চিব্ মোর।
পিয়া বড় ঢিঠ কর রাখল আগোর।

এই সংগে 'স্পর্ধা' কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবক অতি সহজেই মিলিয়ে পাঠ করা যায়:

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু 'যাও।'
সখী ওলো সুখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।
দাঁড়ালো সমুখে; কহিনু তাহারে, 'সরো!'
ধরিল দু'হাত; কহিনু, 'আহা কী কর।।'
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে,
তবু ছাড়িল না মোরে।
শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছি মিছি,
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি!'
সখী ওলো সখী, কহিনু শপথ করে
তবু সে গেল না সরে।

কল্পনা-র অন্য একটি কবিতা হচ্ছে 'লজ্জিতা'। 'লজ্জিতা' কবিতাটি পদাবলীর কুঞ্জভঙ্গের পদের সঙ্গে সংগতি রাখে। বসু রামানন্দের একটি পদে আছে:

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল।
মৃগচন্দনবেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর।।

আর 'লজ্জিতা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে!
আলোক পরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরান ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে।

যেমন কালিদাসের প্রভাব তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব *কল্পনা* কাব্য-গ্রন্থের গানগুলোতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। কতকগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারি—'সংকোচ', 'প্রার্থী', 'সকরুণা', 'লজ্জিতা', 'নববিরহ', 'লীলা' 'যাচ্‌না'—এগুলো সবকটিতেই বৈষ্ণব পদাবলীর আশ্লেষ, লীলা বিলাস, বিভিন্ন দশা, ক্ষোভ আমরা খুঁজে পেতে পারি। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ উপকরণ গ্রহণ করেছেন, প্রতীকও গ্রহণ করেছেন কিন্তু তার তত্ত্বকে মান্য করেন নি। এই মান্য না করার ফলে রবীন্দ্রনাথের গানগুলো এত প্রগাঢ় এবং বিপুল হতে পেরেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সুর এবং ঝংকার এবং তার প্রণয়লীলা রবীন্দ্রনাথকে যে কতটা অভিভূত করেছিল তা এই গানগুলো পাঠ করলেই জানা যায়।

কল্পনা কাব্যগ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিকভাবে কিছু দেশপ্রেমের কবিতা এসেছে যেগুলো কাব্যগ্রন্থের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। এ কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথের মাতৃভূমি প্রীতির নিদর্শন বহন করে। কবিতাগুলোর নাম হচ্ছে —'আশা', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'মাতার আহবান', 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', 'হতভাগ্যের গান', 'সে আমার জননীরে', 'জগদীশচন্দ্র বসু', 'ভারতলক্ষ্মী', 'উন্নতিলক্ষণ'। এগুলোর কোনটাই উচ্ছল আবেগের প্রবণতায় রচিত নয়। এগুলোর মধ্যে রাজনীতির প্রভাব আছে কিছুটা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিদেশের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বদেশের মাটিতে বলিষ্ঠভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির কর্মহীনতা, দুর্বলতা এবং আশাভঙ্গতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে। 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় সুস্পষ্টভাবেই বলছেন যে—হে বঙ্গমাতা তোমার পুত্রের হাতে কোন কাজ নেই, তবু মমতায় তুমি তার শিয়রে বসে থাক। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতায় কবি ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন বিদেশের প্রভুরা যা নির্দেশ করে আমরা তাই করি এবং যারা আমাদের অসম্মান করে তাদের কাছেই আমরা সম্মান যাচ্‌না করি। তিনি আবার বিদেশে জগদীশচন্দ্র বসুর সম্মানে গর্বিত হয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের মাধ্যমে তিনি দেশের গ্লানি উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন।

কল্পনা কাব্যগ্রন্থে 'উন্নতিলক্ষণ' বলে একটি ব্যঙ্গ কবিতা আছে। বাঙালি-রা যারা স্বদেশকে ভুলে বিদেশকে অর্চনা করেন, যারা নিজের অতীত সম্পর্কে বিদেশের বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদেশের মুখাপেক্ষী তাদের সবাইকে নিয়ে এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রচণ্ড ঠাট্টা করেছেন। যে সময়ে এই কবিতা রচিত হয়েছিল সে সময় প্রাচীন ভারত সম্পর্কে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণের মনে অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছিল, তখন এদেশের মানুষ পাশ্চাত্যের এই অনুসন্ধিৎসাকে নিয়ে গর্ব অনুভব

করত। এতে যে হীনমন্যতা প্রকাশ পেত তা বুঝবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শাণিত অথচ চটুল ভঙ্গিতে এহেন দেশপ্রেমিকদের ব্যঙ্গ করেছেন। এই কবিতাটি এবং 'জুতা আবিষ্কার' নামক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার চলিত ভঙ্গির একটি পরীক্ষা করেছেন। কবিতাটির গল্পাংশ অত্যন্ত সহজ। হবুচন্দ্র রাজা মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে তাঁর একটি চিন্তার কথা ব্যক্ত করলেন। পৃথিবীতে এতো ধুলো, তার থেকে প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই? গবুচন্দ্র মন্ত্রী অনেক প্রতিকারেরর পথ খুঁজলেন কিন্তু তাতে বিশৃংখলাই বৃদ্ধি পেল শুধু। অবশেষে এক সাধারণ মুচি চামড়া দিয়ে রাজার পা মুড়ে দিল তাতেই রাজা ধুলো থেকে রক্ষা পেলেন। এখানে বক্তব্য হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা যা সমাধান করা যায় না, নিরংহকার সাধারণ বিচার বুদ্ধিতে তা সমাধান করা সম্ভব। কবি অত্যন্ত চটুল ভঙ্গিতে কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে এই কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন। একের পর এক কবিতার স্তবকগুলো নতুন নতুন কৌতুকের উন্মোচন করে চলেছে, কোথাও তাল ভঙ্গ হয় নি।

কল্পনা-র দেশাত্মবোধক কবিতার পিছনে রবীন্দ্রনাথের কিছু রাষ্ট্রীয় চিন্তা ছিল। তিনি যখন *কল্পনা*-র কবিতাগুলো রচনা করছেন ঠিক তখনই আবার তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছেন। বাংলা ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তখন মানসিকতা ছিল যে আমরা বাঙালি হিসাবে সচেতন থাকব এবং বিদেশী সংস্কৃতির কাছে আত্মবিক্রিত হবনা। তখনকার দিনে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে ইংরেজিতে বক্তৃতা করবার রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা হাস্যকর মনে হত। দেশের দুঃখ দুর্দশার কথা উচ্চারণ করব বিদেশী ভাষায়--এটাকে তিনি অসম্মানজনক মনে করতেন। কবি তাঁর এ কাব্যগ্রন্থে স্বদেশ-বিষয়ক কবিতা ও গানের মধ্যে এই ক্ষোভের পরিচয় দিয়েছেন।

'প্রকাশ' কবিতাটি একটি সরল মাধুর্যমণ্ডিত কবিতা। 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' কবিতা দুটিতে প্রণয়াবেগের যে দ্বৈত রূপের ব্যাখ্যা আছে,--'প্রকাশ' কবিতাটিতেও সেই একই ব্যাখ্যাকে একটু নতুনভাবে উপস্থাপিত হতে দেখি। এক সময় প্রণয়লীলা ছিল সহজ এবং প্রকাশ্য। বর্তমানে তা গোপন এবং অন্তরালবর্তী। এই অন্তরালবর্তী সুগুপ্ত প্রেমের লীলাকে কবি গোপনে অনুভব করবার চেষ্টা করছেন। এর ফলে প্রেম আরও রহস্যময় এবং রসঘন হচ্ছে। কবিতাটির সর্বশেষ স্তবকটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য:

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী--
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনদিন কোন গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি, হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

'অশেষ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় একটি বিশিষ্টার্থক রচনা। কবিতাটিতে কবি বলছেন যে, সকল কর্ম সমাধানের শেষে যখন তিনি বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন তখন আহ্বান এসেছে আবার নতুন জীবন সূত্রপাত করবার জন্য। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স এমন কিছু নয় যে তিনি কর্ম থেকে বিশ্রাম নেবেন। এটা মূলত কাব্য প্রেরণা সম্পর্কে নতুন এক ধরনের অনুধ্যান। আমরা লক্ষ করছি যে *কণিকা* থেকে আরম্ভ করে *কল্পনা* পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কবি প্রকৃতির ধারাক্রম থেকে সরে এসেছেন। কখনও বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন, কখনও কল্পনার আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন, কখন ও কল্পনায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন, কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে কষাঘাত করছেন। কবির মানসিকতা তখন এমন যে তিনি স্থির হয়ে জীবন চিন্তার গভীরে প্রবেশ করতে পারছেন না। তাঁর প্রেরণাদাত্রী জীবনদাতা তাঁকে নতুন কোন সংবাদ দিচ্ছেন না। অকস্মাৎ 'অশেষ' কবিতায় আমরা জীবন-দেবতাকে নতুন রূপে লাভ করলাম। কবিকে জীবন-দেবতা জড়তা থেকে, শৈথিল্য থেকে ডেকে তুলছেন। কবিতাটির শেষে কবি বলছেন যে, কবি হিসেবে তিন তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন না। জীবন-দেবতার আহ্বান তিনি মেনে নেবেন এবং কাব্যক্ষেত্রে আপন দায়িত্ব পালন করবেন। অবশেষে কর্মসমাপনের সময় যখন আসবে তখন,

কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

'বিদায়' কবিতাটি 'অশেষ' কবিতাটির সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানেও কবি বিদায়ের কথা বলছেন, একটি বৈরাগ্যময়, বিশাল বিশ্রামের কথা বলছেন। বিদায়ের অর্থে যে শেষ বা সমাপ্তির কথা বলেছেন তারও যে একটি মহিমান্বিত রূপ আছে একথা কবি বলতে চান।

কল্পনা-র 'বর্ষশেষ' কবিতাটি একটি অসাধারণ তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। একটি সময়ের অমর্যাদা, কালের অপলাপ, প্রবল জীর্ণতা এবং অতীতের প্রতি আসক্তি সবকিছুকে অস্বীকার করে রুদ্রকে গ্রহণ করবার যে আহ্বান, এই কবিতায় আমরা তার পরিচয় পাই। কবিতাটির গঠন-প্রকৃতিতে ইংরেজী ode কবিতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কবি প্রথমে বর্ষশেষের ঝঞ্ঝার উন্মোচনকে প্রকাশ্য করেছেন, ক্রমশ ঝড়ের সূচনায় প্রকৃতি ও প্রাণী-জগতের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার চিত্র এঁকেছেন এবং পরে এই ঝড়ের বিক্ষোভকে স্বাগত জানিয়েছেন। এরপর নতুনকে তিনি সম্ভাষণ করছেন, যে নতুন সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করে সবকিছুকে ব্যাপ্ত করে লুপ্ত করে জেগে উঠবে, এই নতুনকে তিনি সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু করতে চেয়েছেন, যেভাবে ফুলকে ধ্বংস করে ফল প্রকাশিত হয় সে-ভাবে পুরাতনকে জীর্ণ করে নতুন প্রকাশিত হোক—এ কামনা তিনি করছেন। কবিতার শেষে তিনি শান্তিবাণী উচ্চারণ করছেন এই বলে যে, 'নতুনের অভ্যুদয় ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধতার মধ্যে বহু ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করি কিন্তু এই ধ্বংস নতুন জীবন নির্মাণের পক্ষে অপরিহার্য।'

শেলীর 'ode to the west wind' কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে উভয় কবিতার মধ্যে সমান্তরাল কিছু অনুভূতি আবিষ্কার করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শেলীর প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নেই। *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে ode ধরনের এবং আরও কয়েকটি কবিতা আছে। যেমন 'বসন্ত' এবং 'রাত্রি'। তাছাড়া 'বৈশাখ' বলে আরেকটি কবিতা—যা ভাব প্রকল্পে এবং ভাষার তীক্ষ্ণতায় ও দীপ্তপ্রবাহে 'বর্ষশেষ'-এর সমার্থক। কবিতাটি একটি রূপকের ব্যঞ্জনায় মহিমাময়রূপে প্রকাশিত। জটাজুটধারী রূঢ়, রুক্ষ ভৈরবের প্রবল তাপিত রূপের অভিব্যঞ্জনায় কবি বৈশাখকে বরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তৎসম শব্দকে তার নিজস্ব গম্ভীর মাধুর্যে এক প্রকার রুদ্র কাঠিন্যে প্রকাশ্য করেছেন। কবিতার উন্মোচনীতেই এর সন্ধান করেছেন:

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে

নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ বেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

ছন্দের বিগলিত ভঙ্গিকে অস্বীকার করে, পর্ব থেকে পর্বের প্রবাহে কোন প্রকার তরলিত মাধুর্য নির্মাণ না করে একপ্রকার নিষ্ঠুর গদ্যাত্মক বাচন-ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখের যে ভয়ংকর রুদ্র রূপের চিত্রশোভা নির্মাণ করেছেন তা বাংলা ভাষায় অনন্যসাধারণ। দীপ্তচক্ষু যে শীর্ণ সন্ন্যাসীর বন্দনা তিনি করেছেন তাঁর রুক্ষতার সঙ্গে সাজুয্য রক্ষা করেছে শুষ্কজল নদীতীরে,' শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠ। 'বর্ষশেষ' কবিতায় যেমন বিগত বৎসরের সকল জঞ্জালকে পরিত্যাগ করবার কথা বলা হয়েছে তেমনি এখানেও বলা হয়েছে নিখিলের পরিত্যক্ত বিগত বৎসরের ধ্বংসস্তূপের কথা। 'বৈশাখ' কবিতাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কিছু চিন্তা ভাবনা ছিল। একটি পত্রে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ কিম্বা রূপ রচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার একজাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার 'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনা কালের সমস্ত কিছু। ...'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম সেদিন চারিদিক থেকে বৈশাখের যে তপ্তরূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ওই কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তাহলে কোন প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।
> তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নীচের দুটি লাইন নিয়ে—
>
> ছায়ামূর্তি যত অনুচর
> দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
>
> খোলা জানলায় বসে ওই ছায়ামূর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি শুষ্ক রিক্ত দিগন্ত প্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হু হু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, পড়ে দেখো।

তারপরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে।

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছে।

সেদিনকার বৈশাখ মধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল বলেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধূ ধূ করছে মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিলমিল করছে, ঝাউ উঠছে নিশ্বসিত হয়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ সুরে—গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থর-গমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্তস্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠতে থাকে নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কী? নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ। কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোন শব্দই পাইনি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায় তার রূপ নয় তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিই নে। এস্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই।

'বৈশাখ' কবিতাটি তৎসম শব্দের বৈভবের একটি অনুসন্ধান। কঠিন শব্দগুলো নিরবচ্ছিন্ন আবেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে একটি বিস্ময়কর রূপকল্প সৃষ্টি করেছে, যা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তৎসম শব্দের সাহায্যে ধ্বনিময় তন্ময়তা নির্মাণ যেমন সম্ভবপর, তেমনি আবার রুক্ষ উষরতায় শব্দকে কাঠিন্যের মধ্যে চালিত করাও সম্ভবপর।

'অনবচ্ছিন্ন আমি' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলছেন যে, মানুষ হিসেবে প্রকৃতির সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। পৃথিবীর যেখানে যত সম্পদ আছে সেই সম্পদের মধ্যে তিনি বিরাজমান, তেমনি যদি কোথাও শূন্যতা থাকে সেই শূন্যতার মধ্যেও তিনি বিদ্যমান। কবি নিজেকে প্রতিনিধি ভেবেছেন মানুষের, যে মানুষ সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মৃত্যুলগ্ন পর্যন্ত প্রবহমান, সেই মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে চেয়েছেন।*শান্তিনিকেতন* গ্রন্থের তত্ত্বমূলক বক্তব্যের সঙ্গে এই কবিতার বক্তব্যের মিল আছে। সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে আমরা*কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কতগুলো বিশিষ্টতা লক্ষ করি:

এক. *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। বাস্তবের স্পর্শরহিত প্রাচীন সৌন্দর্যের একটি বিমুগ্ধকর অনবগুণ্ঠন এই কাব্যের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে প্রাচীনের

প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকলেও প্রাচীনকে সর্বসময়ের জন্য তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। কেননা মানুষ হিসেবে বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে তিনি কাতর।

দুই. এই কাব্যে তৎসম শব্দের বৈভবকে বিচিত্র রূপে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। কঠিন শব্দগুলো নিজস্ব মহিমায় বাঙ্ময় হয়েছে, শব্দকে রবীন্দ্রনাথ তার অভিধানগত অচলায়তন থেকে মুক্ত করে জীবনের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করেছেন, যে জীবন সৌন্দর্যের, মহিমার, ঔদার্যের এবং আনন্দের।

তিন. *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে প্রণয়ের লীলা-বিলাসঘটিত যে-সমস্ত গান আছে সে-গুলো বৈষ্ণব লীলা-চাতুর্যের অঙ্গীভূত। প্রেমকে তিনি স্পর্শকাতর, মধুর এবং বিগলিত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক করেছেন।

চার. *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে দেশাত্মবোধক কিছু কবিতা আছে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের বিশিষ্ট সত্তা আবিষ্কারে প্রয়াসী, এদেশের মানুষ হিসেবে তিনি এদেশকে গ্রহণ করছেন মমতায়, দুর্বলতায়, আনন্দে এবং হতাশায়। তিনি বিদেশের সাহায্যে দেশের সৌষ্ঠব নির্মাণের পক্ষপাতী নন।

পাঁচ. এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিদেশী ode শ্রেণীর কবিতা আছে যেগুলো বাংলা কাব্যে নতুন। ode-এর নিবেদন ভঙ্গি এবং প্রত্যাশার কথা-গুলো বাংলা কবিতায় একটি নতুন সংযোজন।

ক্ষণিকা

কোনও কবি নিরংকুশ শূন্যতার মধ্যে কবিতা রচনা করেন না। তাঁকে শব্দ গ্রহণ করতে হয় পরিচিত প্রেক্ষাপট থেকে, ভাব গ্রহণ করতে হয় আহরিত কান থেকে এবং ভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়, কখনও কখনও পূর্বসুরিদের কাছে থেকে। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রমটা সৃষ্টি হয় একটি ধারাক্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই। আকস্মিকভাবে নতুন একটি পদ্ধতি কখনই পুরোপুরি উদ্ভূত হয় না, নতুন পদ্ধতি নির্মাণের পশ্চাতে একটি দীর্ঘকালের অনুশীলন থাকে এবং দীর্ঘ অভিযাত্রা থাকে। এই অভিযাত্রাকে অগ্রাহ্য করে কবিতা একটি আকস্মিক অভিব্যক্তিতে পরিণত হয় না। তবে অনেক সময় অনেক কবির প্রকাশভঙ্গি স্পষ্টত নতুন বলে মনে হয় কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নতুন হলেও বহুদিনের শব্দের অধিকার থেকে তা মুক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে চটুল এবং রহস্যপূর্ণ ভঙ্গির কবিতা ভারতচন্দ্র লিখেছেন, ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন, কবিওয়ালারা লিখেছেন এবং খণ্ডিত হলেও

মাইকেল মধুসূদন দত্তও লিখেছেন। পূর্বসুরিদের এই চটুলতা এবং লঘু রসিকতার কবিতা রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের মধ্যেই ছিল এবং স্পষ্টত না-হলেও এই পরিচয়ের প্রেরণা তার মধ্যে কাজ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়করভাবে পুরাতন ধাঁচ অগ্রাহ্য করেছেন এবং নিজস্ব সময়কালের প্রতি সত্য হয়েছেন। কবিতা রচনার পুরাতন ভঙ্গি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় এবং একটি নতুন সমসাময়িক কৌতুকের ধারা ঈশ্বরগুপ্ত এবং কবিওয়ালারা নির্মাণ করেন। অবশেষে মাইকেল মধুসূদন দত্তে এসে আমরা কবিতায় একটি নতুন নির্মিতির বলিষ্ঠ প্রতীতি লক্ষ করি। এই যাত্রাপথে ফল্গুধারার মত কৌতুকের রসাবেশ কিন্তু বিদ্যমান ছিল। মধুসূদনের প্রহসনের মধ্যে যে গানগুলো আমরা পাই তার মধ্যে কবিওয়ালাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আভাষ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থটি একটি নতুন রসাবেশের কবিতার সমষ্টি। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে অনুরূপ ভঙ্গির কবিতা তিনি খুব বেশী লেখেন নি। *ক্ষণিকা* -য় এসে তিনি অকারণ পুলকের চাঞ্চল্যগুলো আনন্দ ও উচ্ছলতার মধ্যে প্রকাশ করলেন। প্রথম কবিতাটিতে এই কৌতুক এবং আনন্দের সুরের উন্মোচন ঘটেছে। 'উদ্বোধন' কবিতাটি সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। তিনি বলছেন যে একটি দিবসের ক্ষণকালীন আলোর মধ্যে ক্ষণিকের গান গাইবার প্রবৃত্তি তাঁর জাগছে। যারা হাসি-উচ্ছলতায় সময় কাটায়, পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, প্রশ্ন করে না এবং নিজেকে অতীতের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে না সেই সমস্ত চঞ্চল-প্রাণ মানুষের জন্য তিনি গাইতে চান না। স্মৃতিকথা মানুষকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত রাখে যার ফলে মানুষ দুঃখ এড়াতে পারে না এবং পুরাতনের সঙ্গে বন্দী দশায় যুক্ত থাকে। কবি বলছেন যে এই স্মৃতির বন্ধনটা তিনি এড়াতে চান এবং মুহূর্তের উচ্ছলতাকে গ্রাহ্য করতে চান। যা ফুরিয়ে যায়, তা ফুরিয়ে যাক, যে ফুল ঝরে গেল তাকে কুড়িয়ে কোন লাভ নেই। যা বোঝা যাচ্ছে না তাকে বুঝবার চেষ্টা করা অথবা যা পাওয়া যাচ্ছে না তাকে পাবার চেষ্টা করা সময়ের অপলাপ মাত্র। যখন যা পাওয়া যায় তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পুরাতন বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দেয়াই ভাল এবং একটি নিশ্চিন্ত সহজতায় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে কর্তব্য। এই পৃথিবীতে চলছে ক্ষণকালীন সুখের উৎসব। সেই উৎসবে কবি যোগ দিতে চাচ্ছেন। তরঙ্গিত নদীর হিল্লোলে আলোর যেমন কম্পন তেমনি উচ্ছলিত চাঞ্চল্যে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে হবে। এভাবে অকারণ পুলকে জীবন-যাপন করাকে কবির কাছে মধুর মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা কবিতায় অকারণ পুলকের ইচ্ছাকে কোন কবি প্রকাশ করেননি। লঘুরসের কবিতা আগেও ছিল, বলেছি এবং *ক্ষণিকা*-র মধ্যে সর্বত্রই এই লঘুভঙ্গি বিদ্যমান। কিন্তু অকারণ পুলকের ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথরে পূর্বে আর কখনই ধরা পড়েনি। *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে 'মদন ভস্মের পূর্বে' কবিতায় ক্ষণকালকে স্পর্শ করবার সহজতা এবং আনন্দিত প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে। সেখানে কবি স্মৃতির ভারকে অস্বীকার করেছেন এবং ক্ষণকালের আনন্দকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন যে উপভোগটা হচ্ছে মুহূর্তের এবং সেখানে কোন দায়-দায়িত্ব নেই। কিন্তু একটি কর্মের ইচ্ছা যদি মনের মধ্যে ভাব স্বরূপ হয়ে থাকে এবং স্মৃতির দাহন যদি মানুষকে নিপীড়িত করে তাহলে ক্ষণকালীন আনন্দের উপভোগটা বিনষ্ট হয়। 'উদ্বোধন' কবিতাটির ভঙ্গি সহজ, সরল এবং লঘু চাপল্যের হলেও কবি এ কবিতায় সাধারণ শব্দ খুব বেশী ব্যবহার করেননি। বরঞ্চ তৎসম শব্দকেই তরল অঙ্গীকারে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। কয়েকটি শব্দমাত্র পাওয়া যায়, যেমন 'টুটে', 'কুড়াতে'; 'চুপে' এবং 'কাঁদনে'। অন্যান্য কবিতায়ও একই অবস্থা, কিন্তু ক্রমান্বয়ে কবিতার পর কবিতা যখন আমরা পেরিয়ে যাই তখন আরও কিছু তরল এবং সহজ শব্দ পাই।

ক্ষণিকা- র দ্বিতীয় কবিতার নাম 'যথাসময়'। অর্থাৎ যখনকার যা তখনকার তা—এই প্রবাদ বাক্যটিকে তিনি নতুন তাৎপর্যে প্রকাশ করেছেন। যখন অসহায়তা একজনকে গ্রাস করে, ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন নয় এবং বন্ধুজনরা হাসিমুখে এগিয়ে আসে না, তখন কবি গৃহের অভ্যন্তরে বসে কবিতা রচনায় ব্যাপৃত থাকতে পারেন। কিন্তু উচ্ছলিত আবেগে যখন চতুর্দিক চঞ্চল, শূন্য নদী যখন জল-কল্লোলে পরিপূর্ণ এবং বন্ধুজনরা যখন হাসিমুখে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায় তখন হচ্ছে তাৎক্ষণিক সময়কে মেনে নেবার পালা। তখন প্রণয়ের সময় এবং মিলনের বাহুবন্ধনের সময়। এই কবিতায় আরও কিছু সহজ শব্দ এসেছে। যেমন—'ওজন দর', 'খিল', 'ক্ষ্যাপা', 'দিল'। 'দিল' শব্দটি আরবি অর্থাৎ হৃদয়। এর ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতায় করেছেন কিনা এ মুহূর্তে বলতে পাচ্ছিনা। কিন্তু সমগ্র কবিতাটিতে তৎসম শব্দের আবেষ্টনীটি বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান থাকলেও কবিতায় একটি তরল গতি কিন্তু নির্মিত হয়েছে।

ক্ষণিকা-র তৃতীয় কবিতাটি—'মাতাল'। 'মাতাল' কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে, আমি

সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না; বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না। একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।" (ভূমিকা: কাব্যগ্রন্থ—১৩১০) কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, হিসেব করে যারা চলে তাদের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নয়, কিন্তু যারা বেহিসেবী তাদের সঙ্গেই মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলতে হবে। কেননা বেহিসেবীরা ঝোড়ো হাওয়ার মুখোমুখি হতে সাহস করে, হিসেব করে কাজ করে না এবং সমস্ত বন্ধন খুলে ফেলে প্রবল উন্মাদনায় সামনের দিকে ছুটে চলে। বন্ধন মেনে নিয়ে চলা একপ্রকার আড়ষ্টতার মত, অনেক পড়াশুনায় মানুষ শুধু পণ্ডিতই হয়, কিন্তু সে পাণ্ডিত্য কোন কাজে লাগাতে পারে না। জ্ঞান শুধু জমা হয়, কিন্তু বিতরণের সুযোগ পায় না। এ সবকিছুকে উড়িয়ে দিয়ে মানুষ যদি বেপরদা হয় তাহলে সে সুখকে পায়, আনন্দকে পায়। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাওয়ার মত আনন্দ আর কোন কিছুতেই নেই, কাজ করার মানুষ তো অনেক আছে কিন্তু অকেজো মানুষের চাঞ্চল্যের সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা হয় না। হিসেব করা পথে না চলে বিপথে যদি চলা যায় তাহলে উচ্ছ্বসিত আবেগে শংকাহীন জীবন-যাপন করা হয়। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তৎসম শব্দের বন্ধন কাটিয়ে উঠেছেন। সহজ গ্রামীণ শব্দ এবং কথ্য বাচনভঙ্গি কবিতাটিতে একটি সরলতা এবং একটি বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণ করেছে। এই ধরনের শব্দগুলো হচ্ছে: 'মাতামাতি', 'রাতারাতি', 'পাঁজিপুঁথি', 'হালের দড়ি', 'ঝোড়ো হাওয়া', 'ফেলাছড়া-ভাঙাছেঁড়া', 'গুঁড়িয়ে', 'দিক-বিদিক', 'সিধা', 'দানোয়', 'এক দমকে', 'কেজো', 'মেলাই', 'সেজো-মেজো', 'ঝেড়ে-ঝুড়ে', 'ছেড়ে-ছুড়ে', 'তকমা-তাবিজ' ইত্যাদি।

'যুগল' কবিতাটি পরিহাস চাতুর্যে মনোমুগ্ধকর। কবি সর্বপ্রকার গম্ভীরতাকে পরিহার করতে বলছেন, বিচার বিবেচনা করে ধর্মের শাসন না মানবার কথা বলছেন এবং সর্বশেষে প্রেমের মধুর ভুবনে আনন্দখেলার উদ্বোধন ঘটাতে বলছেন। কবিতার শেষের চার লাইন অপরিসীম তৃপ্তির রসাবেশে ভরপুর:

ফাল্গুন-মাসে ঘরের টানাটানি—
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর।
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

এই কবিতাটিতে কয়েকটি চলিত শব্দের ব্যাঙ্গাত্মক প্রয়োগ উপভোগ্য হয়েছে। যেমন 'ওঁচায়', 'ছোরা-ছুরী', 'গোল হতেছে', 'খ্যাপা', 'সঙ'।

'শাস্ত্র' কবিতাটিও পূর্বের কবিতাটির সঙ্গে সাজুয্য রক্ষা করে। প্রথমটিতে কবি বিধান দিয়েছেন যে *শ্রীমদ্‌ভাগবত* পাঠ বন্ধ করে *গীতগোবিন্দ* পড়তে হবে। 'শাস্ত্র' কবিতাটিতে বলছেন, বনবাসে যাওয়ার আসল বয়স হচ্ছে যৌবনকাল, বৃদ্ধদের কাজ হচ্ছে ঘরের কোণে বসে থাকা। কবি বলতে চাচ্ছেন, বন্যভূমির উচ্ছলতা এবং আনন্দ উপভোগ করতে হলে এমন একটি বয়স দরকার যে বয়সে মানুষ কোকিলের ডাক শুনে আনন্দ পায়, বকুল ফুলের গন্ধে মাতাল হয় এবং চাঁপা ফুলের ওপর চাঁদের কিরণ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে তো নানান কথা, নানা বিবেচনা-অবিবেচনা, ঘরের মধ্যে নানান লোকের নজর এড়াবার যো নেই অথচ বনে কী অনাবিল শান্তি! সৌন্দর্যের কী মধুরিমা! একজন বৃদ্ধ যদি বানপ্রস্থে যায় সে তো প্রকৃতির কোন কিছুই উপভোগ করতে পারবে না। অত্যন্ত লঘু ও তরল গতিতে কবিতাটি অগ্রসর হয়েছে, ব্যঙ্গ কৌতুকের সংমিশ্রণে কবিতাটি উপভোগ্য হয়েছে। কবিতাটিতে কয়েকটি সহজ সাধারণ শব্দ একটি নতুন অঙ্গ শোভা নির্মাণ করেছে, যেমন: 'গেয়ে-মরে', 'ঢাকাঢাকি', 'মিছে', 'বকাবকি', 'নজর', 'আনাগোনা', 'পয়সা-কড়ি' প্রভৃতি।

'অনবসর' কবিতাটিতে একটি বিপরীত ভঙ্গির মধ্য দিয়ে বিয়োগ-বেদনাকে মূর্ত করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতাটিতে বলা হয়েছে যে, যে চলে গেল তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। হাতে তো সময় নেই একেবারেই, যে সময়টুকু আছে, সে সময় নতুনকে বরণ করাই বরঞ্চ ভাল। শুধু পুরাতন স্মৃতি নিয়ে বসে থাকব—এটা কেমন কথা। এদিকে বসন্ত চলে যাবে, বকুলগুলো দেখতে দেখতে যেখানে সেখানে ঝরে যাবে। এ অবস্থায় সময়ের দাবী মেনে তাৎক্ষণিককে গ্রহণ করাই তো ভাল। এভাবে বিপরীত ভাষণের মধ্য দিয়ে কবি মূলত স্মৃতির রাজ্যে পরিভ্রমণ করছেন। এ কবিতাটিতে চলিত বুলির সুন্দর কতকগুলো প্রয়োগ আছে, যেমন: 'নিদেন', 'মাসেক-খানেক', 'আস্তে' ইত্যাদি।

একই কথা একটু অন্যভাবে বলেছেন 'প্রতিবাদ' কবিতাটিতে। হিসেব-নিকেশ করে, বিচার-বিবেচনা করে সত্যকে আঁকড়ে ধরে আড়ষ্ট হয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে অনেক লাভ মিথ্যা ভাষণে প্রিয়াকে অভিষিক্ত করে আনন্দিত হওয়া। এ কবিতাটিতে তাৎক্ষণিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অভিভূত প্রেম মানুষকে বাচাল করে, তখন কথার কোন ওজন থাকে না, তখন ঢেকেঢুকে এবং মাপজোক করে কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না, তখন অকৃপণ অজস্রতায় মিথ্যা কথার ফুলঝুড়ি নামে। জীবনে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি প্রবল থাকে, তাই হিসেব করে জীবন পরিচালনা করতে চায়।

কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে মিথ্যা ভাষণের তৎপরতাই মুখ্য। কেননা প্রেমিক চায় প্রেমিকাকে অভিভূত করে রাখতে। সেখানে সংকোচের প্রয়োজন নেই, দ্বিধার প্রয়োজন নেই, সেখানে প্রয়োজন চিত্ত-দুয়ার মুক্ত রাখা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন কবি যখন বলেন যে তার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি নতুন ভুবন সৃষ্টি করছে অথবা প্রিয়ার হাসির সুধার বৃষ্টিতে পৃথিবী আজ অভিষিক্ত তাহলে মিথ্যাচার হল বটে, কিন্তু আকুলতার অতিচারে প্রেমের যথার্থ বন্দনা হল। এই কবিতাটিতে অনেকগুলো ব্যাঙ্গাত্মক চলিত বুলি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন 'ঝোঁকের মাথায়', 'ঘুলিয়ে দিয়ে', 'ওজন', 'বেড়ায় রটি', 'সবার বাড়া', 'বেঁটে খাটো', 'ছাঁটো', 'আঁটো' প্রভৃতি।

'যথাস্থান' কবিতাটি চটুলভাবের কবিতা নয়। এর মধ্যে একটি গভীর প্রাণ উন্মাদনা আছে এবং গানের নিবেদনের যথার্থ তাৎপর্য আছে। কবি প্রশ্ন করছেন যে, তাঁর গান কাদের জন্য? সে কি পণ্ডিতদের জন্য, যারা তর্ক-বিতর্কে সময় হারায়? সে কি ভাগ্যমন্ত বিত্তবানের জন্য, যে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করে? সে কি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যে-ছাত্র তার জন্য, যে কোন দিকেই কর্ণপাত করবার সময় পায় না? সে কি গৃহকর্মে নিপুণা বধূর জন্য, সংসার-কর্মের ফাঁকে যার কোন অবসর নেই? না, সে কি যুগল প্রেমিকের জন্য, যারা সরল হাসি এবং উচ্ছ্বাসে সময় কাটায়? কবি উত্তরে বলছেন যে এই সর্বশেষ পর্যায়ের যুগল প্রেমিকের জন্য তাঁর গান। এই কবিতাটিতেও কিছু চটুল শব্দের সমাবেশ আছে, যেমন: 'বিকোতে' 'একজামিনের', 'কেতাব', 'ছেঁড়াছড়া', 'এলোমেলো', 'বালিশ-তলে', 'পাতা-গুলিন', 'ছেঁড়াখোড়া' প্রভৃতি।

'বোঝাপড়া' কবিতাটিতে গভীর বিচার, তত্ত্বানুসন্ধান এবং জিজ্ঞাসাকে অস্বীকার করে যা সহজে তাৎক্ষণিকভাবে আসে তাকেই গ্রহণ করবার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে কবি জ্ঞান, তত্ত্ব এবং জিজ্ঞাসাকে অস্বীকার করতে চাচ্ছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, পৃথিবীতে যা সহজে, নিশ্চিন্তে একজনের কাছে আসে তাকেই গ্রহণ করা ভাল। যা সহজে আসে না তার জন্য মর্মাহত হয়ে কোন লাভ নেই। এটাই স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়া প্রয়োজন যে কেউ হয়তো আমাকে ভালবাসেন, কেউ হয়তো ভালবাসেন না। কেউ হয়তো আমাকে ফাঁকি দেবে, আবার কেউ হয়তো দেবে না, আমার ভাগ্যে হয়তো অনেক কিছু আসবে না, আবার কিছু কিছু হয়তো আমি পাব। এ অবস্থায় ভাল-মন্দ যাই আসুক সেটাকেই মেনে নেয়া ভাল। দুঃখ আসতে পারে, আবার সুখও আসতে পারে; আবার শংকাহীন জীবন-যাপনে দুর্যোগও আসতে পারে, এগুলো নিয়ে বিবাদ করে লাভ নেই। আসলে সুখ কোথায়

থাকে? সরল, সহজভাবে বর্তমান অবস্থাটা মেনে নেয়াটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যায় আকাশ সুনীল রয়েছে এবং ভোরের আলো মধুর লাগছে। কিন্তু আমাদের জীবনে আমরা যা পাই তাতে সন্তুষ্ট হই না, আমরা বিপরীত কিছু সন্ধান করি। অবধারিত মৃত্যু তো আসেই তবুও বাঁচবার কথা ভাবি। এভাবে বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করে তো লাভ নেই? কবিতাটির শেষ স্তবক বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করছি যেখানে চাতুর্যের একটা অপরূপ হিল্লোল আছে :

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মার,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পার সারো।

এই কবিতাটি চলিত বাক্‌ভঙ্গি প্রয়োগের একটা সুমিষ্ট উদাহরণ। এরপরের কবিতাটি 'অচেনা'। এটাও লঘু রহস্যের কবিতা এবং এখানেও শব্দ ব্যবহারে লৌকিক প্রবাহ লক্ষ করবার মত। কবিতাটিতে এমন কিছু বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন যা কখনও কবিতায় ব্যবহার হয় না। যেমন: 'তুর্কিনাচন' অথবা 'ডিমে তা দেয়া'। 'তথাপি' কবিতাটি একই মান্যতার কবিতা। কিন্তু প্রকাশ একটু দুর্বল।

'কবির বয়স' কবিতাটি একটি বিখ্যাত কবিতা। এ কবিতাটিতে কবি বলতে চেয়েছেন যে কবি হিসেবে তিনি সকলেরই সমবয়সী, যেমন শিশুদের, যুবকদের, তেমনি বৃদ্ধদের। বাস্তব জীবনে সময় ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বয়স বাড়ে, কবির বয়সও বাড়ে। কিন্তু মনোজগতে কবি চিরকাল সকল মানুষের সমবয়সী। কেননা কবিতা হচ্ছে সকলের জন্য। পৃথিবীতে মৃত্যু আসে, জীর্ণতা আসে কিন্তু এগুলো পৃথিবীর সামগ্রিক বিস্তারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নয়। যথার্থ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জীবনের অস্তিত্ব এবং প্রাণবন্ত জীবন-যাপন। যেখানে বকুল বনের ছায়ায় তরুণ-তরুণী মিলিত হচ্ছে সে অবস্থাকে স্বীকৃতি না দিয়ে জীর্ণতাকে কি স্বীকৃতি দেব? কিন্তু জীর্ণতার নিজস্ব ব্যাপ্তিতে বার্ধক্যেরও একটা মূল্য আছে। কবিতায় কবি বলছেন, শিশু হোক, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক তিনি সকলেরই সমান বয়সের। অন্যান্য কবিতার মধ্যে এখানে কিছু চলিত বুলির ব্যবহার আছে, যেমন: 'ধরেছে যে পাক', 'শুনতেছ কি', 'পোড়ো-বাড়ি', 'জাগতে আসে',

'হাঁকায় রথ' প্রভৃতি। চলিত ক্রিয়াপদে ভুল হওয়া সত্ত্বেও 'শুনতেছ কি' এই ভঙ্গিটাকে অস্বীকার করা যায় না।

'বিদায়', 'অপটু', 'উৎসৃষ্ট'—এই তিনটি কবিতা মূল কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বটে কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গিতে তেমন সমৃদ্ধ নয়। 'ভীরুতা' কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে, অলীককে—সংগতকে নহে, অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্ট বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে।" (ভূমিকা; কাব্যগ্রন্থ: ১৩১০)। 'বিদায়' 'অপটু', 'উৎসৃষ্ট' এবং 'ভীরুতা'র মধ্যে অনেকগুলো লঘুপাকের শব্দ এবং শব্দবন্ধ আছে, যেমন: 'গাঁথনু', 'হোথায়', 'জোটে', 'ফোটে', 'ঘোমটা-আড়ে', 'এবে', 'ঠাট্টা,' 'হাল্কা', 'উল্টা', 'সোহাগ-ভরা', 'উথলে', 'আড়ে' ইত্যাদি।

'পরামর্শ' কবিতাটি লঘু ভঙ্গিতে রচিত হলেও এর মধ্যে গভীর অনুজ্ঞা এবং জীবন-দর্শন আছে। মানুষ শান্তি চায় এবং শান্তিতে বিশ্রাম চায়। তবুও যার ভাগ্য বিপদের সম্মুখীন হওয়া সে-ই বিপদের সম্মুখীন হয়, নৌকো ঘাটে বাঁধা না রেখে নদীর মধ্যে চালাতে গিয়ে তার নৌকোডুবি হয়। ঝড়ের নেশা যাকে পেয়ে বসে সে মরণের কাছে এগিয়ে যায়। পথচলার নেশা যার প্রবল সে কি কখনও ঘাটে বাঁধা থাকতে পারে। কবি মূলত বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের জীবনে সংকট থাকতে পারে বিপর্যয়ও থাকতে পারে কিন্তু এগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই তো মানুষের সিদ্ধি।

রবীন্দ্র-কাব্য-প্রকৃতির বিবেচনায় 'ক্ষতিপূরণ' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রোমান্টিক কবি, প্রেমের কবি এটাই তাঁর যথার্থ পরিচয়। তিনি যে মহাকাব্য রচনা করেননি তার কারণ যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ তাঁকে আকর্ষণ করেনি, কিন্তু প্রণয়-লীলার মধুরতা তাঁকে অভিভূত করেছে, তাই তিনি প্রণয়ের কবি। যতদূর মনে হয় এই কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* -কে কিছুটা ব্যঙ্গ করেছেন। নিম্নের স্তবকে তার প্রমাণ মিলবে:

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমতো!
পুরাণচিত্র বীরচরিত্র
অষ্ট সর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।
রইল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেন ফেলে ভাবীকেলে
কীর্তিকলাপ।

এই কবিতাটির উদ্দিষ্ট যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তা বুঝতে পাঠকের বেশী বিলম্ব হয় না। মধুসূদনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রকাশ্যে সম্ভ্রম প্রকাশ করেন নি। যুবা বয়সে একবার *মেঘনাদবধ-কাব্য*-এর সঙ্গে হেমচন্দ্রের *বৃত্রসংহার* কাব্যের তুলনা করেছিলেন এবং তুলনায় *বৃত্রসংহার*- কে অনেক উর্ধে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখছি কালের বিবেচনায় *বৃত্রসংহার* সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে কিন্তু *মেঘনাদবধ-কাব্য* পূর্ণ আবেগে বিদ্যমান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ *মেঘনাদবধ* -এর কাব্যনীতি নিয়েও ব্যঙ্গ করেছেন। একবার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে 'সম্মুখ সমরে পড়ি' ইত্যাদি কথাগুলো নিম্নরূপে লিখলেও ভাবগাম্ভীর্য বিনষ্ট হয় না:

যুদ্ধ যখন ক্ষান্ত হল, বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে ক্রমে গেলেন যমপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই—ইত্যাদি।

মধুসূদনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপতা বাংলা কাব্যধারায় একটি দুঃখজনক অধ্যায়।

'সেকাল' কবিতাটি খুবই বিখ্যাত। কালিদাসের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং কালিদাসের সময়কালের প্রতি তাঁর আনন্দিত সমর্থন কবিতাটির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। কালিদাস ছিলেন সংস্কৃত কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি। চারশত খ্রিস্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি উজ্জয়নী বা অবন্তীতে বাস করতেন। কালিদাস গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সম্মানিত সভাকবি ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়কাল তিন'শ পঁচাত্তর থেকে চারশ চৌদ্দ খ্রিস্টাব্দ। কালিদাসের রচনাগুলোর নাম—*ঋতু-সংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মালবিকাগ্নি মিত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম,* ইত্যাদি। কালিদাসের যুগ ছিল ভারত-ইতিহাসের একটি সমৃদ্ধ যুগ এবং প্রণয়ের মধুরতার একটি বিলাসবহুল কাল। রবীন্দ্রনাথ সেই

কালের সমৃদ্ধির মধ্যে এবং প্রণয়ের মধ্যে যেতে চান। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগের সমৃদ্ধমান উপভোগ্য নিজের জন্য কাম্য করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব ছিল প্রচুর এবং প্রবল। কালিদাসের প্রভাবটিই তাঁর উপর প্রবল ছিল। 'প্রাচীন সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাবের মুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি প্রাচীন ভারতের কথা স্মরণ করতে চেয়েছেন যেখানকার সবকিছুই কবির কাছে মধুর, আনন্দময় এবং আবেগময়। তিনি বলছেন, "আমি যদি কালিদাসের কালে জন্ম নিতাম এবং দৈবযোগে রাজসভায় স্থান পেতাম তাহলে একটি শ্লোকে রাজার স্তুতি করে উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে একটি কানন ঘেরা বাড়ি চেয়ে নিতাম। রেবা নদীর তটে চাঁপা ফুলের গাছের তলে বসে আনন্দ-কোলাহলে মত্ত হতাম।" উজ্জয়িনীর উপবনে কেতকীর বেড়া, বর্ষার সমাগমে পাখিদের ব্যস্ততা, গ্রাম বৃদ্ধদের গল্প বলা, সব কটি দৃশ্যই কবিকে আবেগে উদ্বেলিত করেছে। তিনি যে কালিদাসের প্রাচীন ভারতের বিপুল শ্রী ও বহুল ঐশ্বর্যের দ্বারাই অভিভূত হয়েছেন তাই নয়, তিনি সেই যুগের সৌন্দর্য, আনন্দ এবং প্রণয়কুশলতায়ও বিহ্বল হয়েছেন। সেই প্রাচীন ভারতের নদী গিরি নগরীর নামগুলোও কবির কাছে শ্রুতিমধুর মনে হয়েছে। 'শ্রোত্ররসায়ন' এই নামগুলো রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, ছন্দে এবং সুরে এমনভাবে উপস্থিত যে তার মধ্যে একটি শোভা, সম্ভ্রম এবং শুভ্রতা বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় আমরা আবিষ্কার করি যে কবি সেই প্রাচীন ভারতে তাঁর কল্পনাকে পাঠাতে চেয়েছেন। যেহেতু সেখানে সহজে উপনীত হবার জন্য কোন পথ নেই—তাই, তিনি ভাষায়, ভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে, ভুল-ভ্রান্তিতে, আলো-আঁধারে কালিদাসের কালের ভারতবর্ষের একটুখনি আলো এবং বাতাস পেতে চেয়েছেন। যেহেতু তিনি সে যুগকে কখনও সম্পূর্ণ করে পাবেন না তাই কল্পনায় সে যুগের নতুন চিত্ররূপ নির্মাণ করেই তিনি আনন্দিত। সে যুগের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় হবে না সত্য কিন্তু তিনি প্রবোধ পাচ্ছেন এই ভেবে যে এখনও ফুল গাছে ফোটে, এখনও অশ্বত্থ গাছ ছায়া বিছায় এবং এখনও দক্ষিণের বাতাস মধুর লাগে। খেলাচ্ছলে কবি বলছেন যে একটু অন্যরকম পোষাক-পরিচ্ছদ পরলে কি হয়, আজকের দিনেও রমণীদের চোখে সেই প্রাচীনকালের কটাক্ষ বিদ্যমান আছে। কবি সান্ত্বনা পাচ্ছেন এই ভেবে যে, কালিদাস তো ইতিহাসের পাতায় আছেন কিন্তু কবি তো এখনও বেঁচে আছেন। কালিদাসের কালের স্বাদ-গন্ধ তো কবি পাচ্ছেন, কিন্তু এখনকার কালের স্বাদ-গন্ধ তো কালিদাস

পাবেন না। 'সেকাল' কবিতাটির অনুপম ছন্দ-স্পন্দন পাঠককে সর্বদাই মুগ্ধ করে।

'প্রতিজ্ঞা' কবিতাটিও চটুল রসের। কবি কামিনীসঙ্গ যাচ্ঞা করছেন এই বলে যে, তপস্বিনী না পেলে তিনি তাপস হবেন না; বাইরে ভুবন ভুলানো হাসি হাসবার কোন লোক না থাকলে তিনি বাইরে বেরুবেন না; নারীকে নিয়েই তিনি আনন্দে নতুন ভুবন গড়তে চান। 'পথে' কবিতাটিতে মানব জীবনে প্রকৃতির অধিকারকে কবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'কথান্তর' কবিতাটিতে পুরনো দিনের কাম্য আহরণের কথা আছে। এখানে কালিদাসের কালের কথা নেই, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামের কথা আছে। এ কবিতাটিতেও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা এবং সখ্য কবি স্থাপন করতে চেয়েছেন।

'কর্মফল' কবিতাটিতে কবি তাঁর সমালোচকদের বিদ্রূপ করেছেন এবং এ বিদ্রূপটি খুবই শাণিত। তিনি বলছেন যে, মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে তিনি যদি তাঁর কাব্যের সমালোচক হন তাহলে দেখা যাবে একালে যাঁরা তার সমালোচক ছিলেন তাঁরাই নতুন জন্মে তাঁর প্রশস্তিপত্র লিখছেন। 'কবি' নামক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচকদের তীব্র বিদ্রূপ করছেন। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' একটি দেশাত্মবোধক কবিতা কিন্তু অন্যান্য কবিতার মতই চটুল ভঙ্গিতে লেখা। 'বিদায়রীতি' কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ নয়। 'নষ্টস্বপ্ন'ও তেমনি। একই ভঙ্গিতে লেখা 'একটি মাত্র' কবিতাটি একটি তরলতার স্বাদ প্রকাশ করে। 'সোজাসুজি' কবিতাটি এগুলোর মধ্যে একটু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগের একটি কবিতায় কবি প্রণয়কে অত্যন্ত সাম্প্রতিক এবং তাৎক্ষণিকরূপে লঘু ব্যঞ্জনায় যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি এখানেও সেই একই কথা বলছেন। বলছেন যে, একটি রমণী এবং তার মধ্যে যে প্রণয় তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সরল, তার মধ্যে কোনই জটিলতা নেই। মানুষ বলে থাকে যে প্রেমের পথে অনেক জটিলতা এবং বাঁকা গলি থাকে কিন্তু কবি বলছেন যে তা মোটেই সত্য নয়। তাঁর বিবেচনায় প্রেমটি সহজেই স্পষ্ট এবং যুবক-যুবতীর আকুলতার সহজ প্রকাশ। 'অসাবধান', 'স্বপ্ন শেষ', 'কূলে', 'যাত্রী', 'দুই তীরে', 'সম্বরণ', 'বিরহ', 'ক্ষণেক দেখা' এবং 'অকালে'-কবিতাগুলো *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থের মূল সুরের সঙ্গে একই তারে বাঁধা। কবি এগুলোতেও তাৎক্ষণিকতা এবং ক্ষণকালীন আনন্দকে উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

পূর্ব বাংলার ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং নদীমাতৃক দেশের স্বভাব *ক্ষণিকা*- র অধিকাংশ কবিতার পটভূমি রচনা করেছে। প্রকৃতির স্বভাবগুলো

এ অঞ্চলের মানুষ যেভাবে প্রত্যক্ষ করে, ঊষর অঞ্চলের মানুষ সেভাবে প্রত্যক্ষ করেনা। এখানে বর্ষাকালের নদীর উদ্বেলতা লক্ষ করা যায়, মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ চতুর্দিকে অন্ধকার ছড়ায়, বিদ্যুতের চমক কখনও কখনও দেখা যায়, বাতাসে প্রবল প্রবাহ অনুভব করা যায় এবং মনে হয় বৃষ্টির জলের সিঞ্চনে সমস্ত প্রকৃতিতে একটি সিক্ত শীতলতা তৈরি হয়েছে। কোথাও আমরা বৃক্ষরাজির বর্ণনা দেখিনা, এ অঞ্চলে পাহাড় নেই, এ অঞ্চল শুধু শোভামান সিক্ত, শান্ত, পরিচ্ছন্ন প্রান্তরের। প্রাণীকুলের মধ্যে এখানে সবৎসা গাভী আছে এবং কালো মেয়ে আছে যে প্রকৃতির সঙ্গে আশ্চর্য সজীবভাবে মিশে আছে। 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটি বাংলা কাব্যজগতে একটি অসাধারণ কবিতা। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি গ্রে' শীর্ষক কবিতা-গুলোর সঙ্গে এর একটি আত্মিক মিল আছে। সেখানে যেমন হাইল্যান্ডের প্রকৃতির সঙ্গে একটি মেয়ে পুরোপুরি মিশে গেছে, এখানেও তেমনি প্রান্তরের স্বভাবের সঙ্গে কৃষ্ণকলি পুরোপুরি মিশে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মমতার ভাণ্ডার উজাড় করে 'কৃষ্ণকলি'-এর চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। হরিণের মত চঞ্চল গ্রামের একটি কালো মেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য নির্মাণ করে গ্রামের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবি তার নাম জানেন না, কিন্তু মেঘলা দিনে তাকে দেখে তার নামকরণ করেছিলেন 'কৃষ্ণকলি'। তাঁর মাথায় ঘোমটা ছিল না, একটি বেণী তার পিঠের ওপর দুলছিল। আকাশে মেঘ দেখে কালো মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়েছিল, শ্যামলা রং-এর দুটি গাভী বৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে ডাকছিল এবং ত্রস্তপদে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটি ছিল প্রকৃতির মত স্বাভাবিক এবং সচল, যৌবনের লজ্জা তার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনি। মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের কাছে এক অসামান্য চঞ্চলারূপে দেখা দিয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশান কোণে মেঘ যখন জমে, আষাঢ় মাসে তমাল বনে কালো কমল ছায়া যখন পড়ে, শ্রাবণ-রাত্রিতে হঠাৎ খুশী যখন চিত্তে জাগে, কৃষ্ণকলি-কে দেখে কবির মনেও সেই রকম আনন্দ জাগছে। কবিতাটিতে প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা নেই, কালো মেয়েটিরও প্রচুর বর্ণনা নেই, কিন্তু স্বল্পমাত্রার কয়েকটি বর্ণনায় একটি অপরূপ চিত্র নির্মিত হয়েছে।

'আষাঢ়' এবং 'নববর্ষা'—এই দুটি কবিতা বর্ষার নিগূঢ় লাবণ্যের কবিতা। ছন্দের ত্বরিত গতির মধ্য দিয়ে বর্ষাকে কবি আহ্বান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্র আঁকবার দক্ষতা অসাধারণ। জলরঙের সুন্দর প্রয়োগে এই চিত্রগুলো ক্যানভাসে টেনে তোলা যায়। চিত্রকর্মে যেমন পরিপ্রেক্ষিতগত একটি বিবেচনা থাকে যেখানে দূরের এবং নিকটের ছবির মধ্যে তারতম্য

নির্মাণ করা হয়। এ দুটি কবিতাতেও তাই করা হয়েছে। 'আষাঢ়' কবিতাটিতে কবি বলছেন, আকাশে কোথাও আলোর আভাস নেই, সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, বৃষ্টি পড়ছে প্রবল বেগে, আউশ ধানের ক্ষেত জলে ভরে গিয়েছে, মাঠের মধ্যে যে গাভীগুলো আছে সেগুলো এখন গোহালে আনতে হবে, খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে এবং সবারই এখন ঘরে ফেরার সময়, বাইরে বেরুবার সময় নয়, যদিও কবি বলছেন যে এই বৃষ্টির মধ্যে কারও উচিত নয় ঘরের বাইরে যাওয়া, কিন্তু কথাটি উপাদেশাচ্ছলে বলেননি, বলেছেন কৌতুক করে। অর্থাৎ কেউ যদি বৃষ্টিতে ভেজে তাহলে তার যেন আপত্তি নেই। 'নববর্ষা' কবিতাটিতে তিনি কালিদাসের যুগের বর্ষানুরাগকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানকার অনেকগুলো দৃশ্যই কালিদাসের যুগের। যেমন প্রাসাদের ভিতরে কে যেন কেশ এলিয়ে দিয়েছে, নদী কূলে বসে থাকা উদাসিনী রমণী, নির্জনে বকুল শাখায় কে যেন দোলনায় দুলছে—এ সমস্ত দৃশ্য কালিদাসের কালের; আবার বাংলাদেশের দৃশ্য হচ্ছে নতুন ধানের গাছগুলো বাতাসে দুলছে, তীরকে প্লাবিত করে নদীর জল গ্রামে প্রবেশ করছে—এই সমস্ত দৃশ্য। বর্ষার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলটি বাংলাদেশের, কিন্তু কালিদাসের যুগের বর্ষাকেও কবি এর সঙ্গে সমন্বিত করেছেন।

'দুই বোন' কবিতাটি চটুল ভঙ্গিতে লেখা একটি মধুর রসের কবিতা। গ্রামের দুটি মেয়ে ঘট ভরতে এসেছে নদীতে এবং ঘট ভরে গৃহে ফিরে যাচ্ছে হাসিতে কলতানে সময়কে মুখর করে। এখানেও গ্রাম বাংলার একটা সজীব স্নিগ্ধ চিত্ররূপ আমরা পাই।

'দুর্দিন' কবিতাটিও বর্ষার কবিতা। বিগত রাত্রে ঝড়-ঝঞ্ঝায় পথ ভেসে গেছে, বাগানের বেড়া ভেঙ্গে গেছে, ফুলের গাছগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সেই সময় প্রেয়সী রমণী যদি আসে তখন তাকে ফুল দিয়ে বরণ করার সুযোগ কোথায়। প্রেমের এক রসাবেশ কবি সৃষ্টি করেছেন বর্ষার বিপুল উচ্ছলতাকে উপলক্ষ করে। কবিতাটির নিম্ন স্তবকটি উদ্ধৃতিযোগ্য:

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বার বার—
ফলের অভাব ঘটেনি তোমার,
বন আলো করি ফুটেছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি।

এ ভরা বাদলে অর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি।

'অবিনয়' কবিতাটি আষাঢ়ের বর্ষণের পটভূমিতে একটি নিটোল প্রণয়াবেগের কবিতা। একই ধরনের অন্য একটি কবিতা হচ্ছে 'ভর্ৎসনা'। এ কবিতাটিও বর্ষার কুহকের প্রণয়ের দৃষ্টিপাতের একটি মাধুর্যময় চিত্র। এভাবে আষাঢ় মাসের বাদলা দিনের এবং রাতের অভিব্যঞ্জনা নিয়ে আরও অনেক কবিতা আছে, যেমন: 'সুখ-দুখ', 'খেলা', 'কৃতার্থ', 'মেঘমুক্ত', 'আবির্ভাব' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলো সহজ-সরল বর্ষার বর্ণনা নয়, কিন্তু বর্ষার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনময়তার বর্ণনা।

কল্পনা কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত আমরা প্রায়ই লক্ষ করেছি সকল কাব্যগ্রন্থেই নানা রকম কবিতার মিশ্রণ আছে। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের নামের সঙ্গে বেশীর ভাগ কবিতা সঙ্গতি রক্ষা করলেও এমন অনেক কবিতা সেসব গ্রন্থে প্রবেশ করেছে যেগুলোর সঙ্গে মূল সুরের কোন সম্পর্ক নেই। *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থে আমরা লক্ষ করেছি যে কল্পনার বিমুগ্ধ প্রসার অনেক কবিতায় থাকলেও, দেশাত্মবোধক কিছু কবিতা সেখানে স্থান পেয়েছে, আবার কিছু ব্যঙ্গ কবিতাও সেখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থেই আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষ করি যে এখানকার সব কটি কবিতাই একই চটুল ভঙ্গিতে লেখা এবং নিঃসংকোচ অবিমিশ্রতায় কবিতাগুলো আমাদের মুগ্ধ করে। এরপর আমরা লক্ষ করব যে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থই অবিমিশ্র ভঙ্গির শাসনে গ্রন্থিত।

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি:

ক. এই কাব্যগ্রন্থটি যৌবনের উচ্ছলতার একটি ব্যাঙ্ময় রূপ। কবি এমন একটি জীবনের রূপ নির্ণয় করেছেন যা কখনও বসন্তের রূপ, আবার কখনও বর্ষার সচ্ছলতার রূপ।

খ. অধিকাংশ কবিতার পশ্চাদভূমি হিসেবে প্রকৃতির ঔদার্যকে পাচ্ছি এবং সেখানে তিনি নরনারীর লীলাবৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

গ. এখানকার প্রায় সব কটি কবিতা চটুল ভঙ্গিতে এবং দ্রুতগতির ছন্দের মধুর কম্পমানতায় রচিত। এই ভঙ্গির কোথাও ছেদ ঘটেনি।

ঘ. কবিতাগুলোতে এমন সব শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন যা অত্যন্ত সহজ, স্পষ্ট এবং লৌকিক। অতীতে রবীন্দ্রনাথ কখনও এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেননি। কবিতার ভঙ্গির সঙ্গে এই শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে।

ঙ. *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থে গানের সহজাতীয় কিছু কবিতা আছে যেখানে ভাষা কোনও নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটি মায়া রচনা করে।

চ. *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থটি একটি অবিমিশ্র কাব্যসম্ভার।

নৈবেদ্য

রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ ও নিবেদনের কবিতা অনেক লিখেছেন। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর চিত্তের নিবেদন, একাগ্রতা, বিনয় এবং আপনাকে নিসংশয়ে উৎসর্গীকরণের ব্যঞ্জনা পাই। গৌতম বুদ্ধ মানবজীবনে উদ্যমের কথা বলেছেন। উদ্যমের অর্থ হচ্ছে প্রধান বিষয়। বুদ্ধের বিচারে মানব জীবনের প্রধান বিষয় হচ্ছে চিত্তে অকুশল চিন্তা আসতে না দেয়া এবং সেই সঙ্গে এমন একটি বোধিজ্ঞান লাভ, যার সাহায্যে চিত্তের প্রীতি অর্জন করা যায় এবং জীবনের প্রতি আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থে আত্মনিবেদনের এবং সর্বস্ব পরিহারের যে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের চিন্তার মিল আছে। পরম প্রভুর কাছে আত্মনিবেদনের সুরটাই *নৈবেদ্য*-এর প্রধান সুর। এই কাব্যগ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ একাগ্রভাবে ভক্তিপথযাত্রী। তিনি এখানে সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছেন। এই সত্য ধর্ম হচ্ছে: অন্তর্যামীর কাছে শরণ প্রার্থনা করা এবং অন্তর্যামী প্রভুর আলোতে আপন গৃহকে উজ্জ্বল করা। পৃথিবীতে শোক বিহ্বলতা থাকে, শোক-যন্ত্রণা থাকে, কিন্তু প্রভুর আলোকে আলোকিত হলে জীবনের সকল গানি মুছে যায়। কিন্তু এই অধিকার অর্জন করতে হলে একটি বিনয় নম্রতার প্রয়োজন এবং সর্বস্ব ত্যাগের প্রয়োজন। সেই বিনয় নম্রতা এবং সর্বস্ব ত্যাগের কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *নৈবেদ্য*। পৃথিবীতে মানুষ ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে, কিন্তু চিত্তকে সকল প্রকার কামনা থেকে, জীবনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত করলেই ত্যাগের অধিকার জন্মায়। একেই বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে—বিমুক্তিতে বিমুক্ত হওয়া।

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থটি একটি পরিপূর্ণ, অবিমিশ্র লিটোল কাব্য। *ক্ষণিকা* থেকে যে অবিমিশ্রতার সূত্রপাত হয়েছে সেই ধারা আর কখনও প্রশমিত হয়নি। *নৈবেদ্য* ১৩০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *নৈবেদ্য*-এর মূল সুর সম্পর্কে বিশেষ করে 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' কবিতাটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য:

> প্রকৃতি তাহার রূপ-রস বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিবল তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে-সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না। সেই মোহকে

আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বন্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতি সম্বন্ধে অসচেতন; কেহ বা মন্দ গমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে, বুঝি বা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই, যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছে দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে; প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের,সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।

নৈবেদ্য-এর অনেকগুলো কবিতা মূলত গান এবং সুরের প্রত্যয়ে প্রবলভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। প্রথম কবিতাটি এর নিদর্শন। কবি বলছেন, হে প্রভু, প্রতিদিন আমি পার্থিব সকল প্রকার আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত হয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে চাই, অপার আকাশের নীচে বিজনে-বিরলে নম্র হৃদয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে চাই, অপার পৃথিবীর বিচিত্র কর্ম কোলাহলের মধ্যে জনারণ্যের মধ্যেও তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে চাই। যখন এ সংসারে তোমার নির্দেশিত কর্ম সমাপন শেষে তোমার সম্মুখে দাঁড়াব তখন একাকী তোমার সম্মুখবর্তী হওয়ার অধিকার যেন অর্জন করি। কবিতাটিতে কোন রকম উচ্ছ্বাস নেই, উপমা-রূপকের কারুকার্য নেই, বিশেষ্য-বিশেষণের অলংকার নেই, শুধু নিরাভরণ পরিচ্ছন্ন ভক্তির অঙ্গীকার আছে। আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকর্মের শেষ পর্যায়ে, কী রকম সহজ ও নিরলংকার হয়েছেন। *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় এই সহজতা আমরা প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাটিও একই সুরে বাঁধা। অগাধ ভক্তির আন্তরিক প্রকাশে কবিতাটির ভাষণ অত্যন্ত বিনম্র। কবি বলছেন যে, তিনি অন্তরের আলোতে আলোকিত হতে চান, বিধাতা যেন তাঁর গৃহকোণকে পূর্ণভাবে আলোকিত করেন। সকল অন্ধকার দূরীকৃত হোক এবং বিধাতার মহিমার আলোয় আলোকিত হয়ে তিনি প্রিয়জনকে ভালবাসতে চান। কলঙ্ক তো মানুষের থাকে, বিধাতার আলোকের স্পর্শে তাঁর সকল কলঙ্ক যেন সোনায় পরিণত হয়। মানুষের দেয়া আলোতে শুধু ছায়া তৈরি

হয় এবং কালিমা ছড়ায়। কিন্তু বিধাতার উদ্ভাসিত কিরণে একটি মহিমার দীপ্তি জাগে। সেই মহিমার মধ্যে তিনি জেগে উঠতে চান। তৃতীয় কবিতাটিও একই সুরে বাঁধা। কবি বলছেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত কিছু প্রভুর চরণে অর্পণ করবেন। প্রত্যূষে প্রথম নিদ্রাভঙ্গে তিনি প্রতিজ্ঞা করতে চান যে তার সমস্ত দিনের কর্ম প্রভুর চরণে অর্পণ করবেন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার মধ্যে তা আর সম্ভব হয় না। তবু যে ইচ্ছাটা জাগে এটা তো বড় কথা। কর্মসাধন করতে করতে ইচ্ছা জাগে যে কর্মসাধনের শেষে বিধাতার কাছে নিবেদনের সুযোগ পাব। এভাবে রাত্রি আসে তখন মনে হয় শয়নের শান্তি, অবসন্নতার মধ্যে বিধাতার চরণে নিবেদিত হব। এইভাবে ইচ্ছার মধ্য দিয়ে মানুষ বিধাতার কাছে নিবেদিত হবার সুযোগ পায়। এই কবিতাটি অত্যন্ত নিরাভরণ, অনলংকৃত এবং নিশ্চিন্ত। *নৈবেদ্য*-এর কবিতাগুলো পাঠ করলেই বোঝা যায় যে সহজ সরল ভাষণ কত উন্মুখর হতে পারে। চতুর্থ কবিতাটিও একটি নিবেদনের সুর বহন করছে। কবিতাটিতে একটি শান্ত বরাভয়ের রাগিণী ধরা পড়েছে। কোন অতিভাষণ নেই, কোন অলংকার নেই, একজন নির্বিরোধী সাধক ভগবানের কাছে আশ্রয় কামনা করেছেন। বলা হচ্ছে বিধাতার যে রাগিণী তা যেন আমাদের জীবনকুঞ্জে সদাসর্বদা বাজতে থাকে এবং বিধাতার অবস্থান যেন হৃদয়ের মধ্যে অক্ষয় থাকে। চতুর্দিক থেকে যেন একটি অলৌকিক সৌন্দর্য আমাদের আকুল করে রাখে এবং এভাবে সকল বিদ্বেষ থেকে আমরা যেন মুক্ত হতে পারি। এ ভাবনার অধিকার যেন আমাদের জন্মায় যে গৌরব তো একমাত্র জগৎ প্রভুর, গৌরব তো আমাদের কারও নয়। একই ধারায় পরবর্তী কবিতায় কবি বলছেন যে, আমরা আলস্যে ও অবহেলায় সময় কাটাতে পারি, দরজা বন্ধ করে শ্রান্তিতে নিদ্রামগ্ন থাকতে পারি, কিন্তু বিধাতার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন দরজা ভেঙ্গে আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সুপ্তি যদি না ভাঙ্গে তাহলে বজ্রনির্ঘোষে আমাদের যেন জানিয়ে দেন। আরও অগ্রসর হয়ে কবি বলছেন, বিধাতার কথা চিন্তা করার সময় অসময় নেই। যখন সংসারের কর্মমোহে আমরা আচ্ছন্ন তখনও বিধাতার নাম উচ্চারণ করা যায়। দুর্বল মানুষ পূজার আয়োজন করতে শেখেনি, সর্বদাই কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকছে, তার মধ্যে তারা যে বিধাতার কথা স্মরণ করছে এটাই তো তাদের সাধনা। দুর্বল মানুষ শুধু এটাই ভাবতে শিখেছে যে, যত অবহেলা ভরে তারা বিধাতার প্রতি লক্ষ করুক না কেন একদিন বিধাতা অমৃতে তাদের জীবন পূর্ণ করে দেবেন। সপ্তম সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন যে পৃথিবীর পরিপূর্ণতায় এবং উচ্ছলতায় যদি দৃষ্টি ভরে যায় তাহলে সেই অবলোকনের মধ্যেই তো

বিধাতাকে অবলোকন করি। সংসারে পিতা-মাতা-পুত্র এবং পরিবার নিয়ে আমরা যে মমতার বন্ধন নির্মাণ করি সেই মমতার মধ্যেই বিধাতাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। একটু পরে এগিয়ে গিয়ে কবি বলছেন সংসারের শতকর্মের বন্ধনের মধ্যে তো আমাদের জীবন। সেই বন্ধনের মধ্যেই বিধাতার গরিমা প্রকাশিত হোক। কাব্যের কথা যেভাবে ছন্দে বাঁধা পড়ে, প্রতিদিনের কর্মের মধ্যেও তেমনি বিধাতার গরিমা বাঁধা পড়বে। ঠিক একই কথা, নয় সংখ্যক কবিতাতেও এসেছে। কবি বলছেন যে, তাঁর স্বল্প সময়ের অস্তিত্বের মধ্যে তিনি ভগবানকে অনুভব করতে চান এবং মানুষকে যে তিনি ভালবাসেন সেই ভালবাসার মধ্যে ভগবানের প্রতি ভালবাসা যুক্ত হয়ে আছে। দশ সংখ্যক কবিতাটি বিনয়ের এক অসাধারণ তাৎপর্য বহন করে। চতুর্দিকে অজস্র মানুষ আমাদের অত্যন্ত নিকটে। কিন্তু অদৃশ্য থেকে বিধাতা আমাদের আরও অধিক নিকটে। কবি বলছেন আমরা কথা বলি, কথা শ্রবণও করি, কিন্তু এসব কথা ছাড়িয়ে বিধাতার বাণীতে আমাদের হৃদয় ভরপুর রয়েছে। বিধাতাকে পাবার জন্য অন্য কাউকে দূরে সরাতে হবে না, সকল বন্ধন অতিক্রম করে তিনি চিরকাল হৃদয়ে বিদ্যমান রয়েছেন। চতুর্দিকে অন্ধকারের মত ঘন সংশয় বাস করলেও তার মধ্যেই প্রত্যয়ের অবস্থান। এই প্রত্যয়কে কখনই বিলুপ্ত করা যাবে না। সংসারে শত সংকট এবং সংশয় রয়েছে কিন্তু বিধাতা তার মধ্যেই অটল শান্তির মত বিরাজমান। সব কিছুরই অপসরণ আছে এবং পরিবর্তন আছে, কিন্তু বিধাতার আনন্দের কোন বিনাশ নেই। এই কথাগুলো কবি নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন বার সংখ্যক কবিতায়। সেখানে বলছেন যে, সকল সংশয় অতিক্রম করেই বিধাতার আনন্দ বিরাজমান থাকে, তাঁকে সন্ধান করতে হয় না, তিনি আপনি এসে ধরা দেন।

যেসময় কবি *নৈবেদ্য* রচনা করছেন সে সময় শিলাইদহেতে বিচিত্র কর্ম-উদ্দীপনায় তিনি বসবাস করছেন। বিষয় সম্পত্তির দিকে পরিপূর্ণ সজাগ দৃষ্টি ছিল, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা-বার্তাও বলতেন এবং আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবরা প্রায়ই কবির কাছে যাতায়াত করতেন। একদিকে কর্মব্যস্ততা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অতিথি সৎকারের ব্যস্ততা এরই মধ্যে অবসরহীন সময়-ক্ষেপণের সঙ্গে *নৈবেদ্য*-এর ধ্যান-নিমগ্ন কবিতাগুলো রচনা করছেন। তাই আমরা যদি গভীরভাবে *নৈবেদ্য*-এর কবিতাগুলো পাঠ করি তাহলে কবির সে সময়কার কর্মব্যস্ততার আভাস পাব। তিনি কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে 'বাক্যের ঝড়'-এর কথা বলেছেন, সংসার-কর্মে শত সংকটের কথা বলেছেন,.যে সমস্ত লোক বলতে এসেছেন তাদেরকে কথা

বলা থেকে বিমুখ করছেন না এমন কথাও আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বিরাজমান শান্তির কথাও আছে। কবি সকল প্রকার বাক্য উচ্চারণের মধ্যে এবং সকল কর্মের মধ্যে বিধাতার আরাধনাকে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। মনে হয় জনারণ্য এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি নিভৃত শান্তিলোক নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। একই সময়ে কবি আবার *ভারতী* পত্রিকার জন্য *চিরকুমার সভা* নামক একটি হাস্যরসের উপাখ্যান রচনা করছিলেন। অর্থাৎ কবি একটি পরিপূর্ণ আনন্দ ও সুস্থতার মধ্যে বাস করছিলেন যার ফলে একটি অনাবিল শান্তির অধিকার তাঁর জন্মেছিল। এই অনাবিল শান্তির কথা *নৈবেদ্য*-এর কবিতাগুলোতে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাও আছে যে, যত মান তিনি বিভিন্ন কাজে পেয়েছেন একদিন সেগুলো সব দূরে চলে যাবে, সেদিন বিধাতাই হবে তাঁর একমাত্র অবলম্বন। এই জন্য কবি বলতে চান যে তিনি সফল গর্ব দূর করে দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু বিধাতার গর্ব কখনও ছাড়বেন না। তাঁর সে সময়কার কর্মব্যস্ততা এবং সংসার-নির্ভরতার পরিচয় নিম্নের স্তবকে পাওয়া যায়:

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল জঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে
তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।

নৈবেদ্য-এর কয়েকটি কবিতায় বিশেষ করে আঠার এবং একুশ সংখ্যক কবিতায় মৃত্যুর কথা আছে। মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতার মধ্যেও মৃত্যুচিন্তা জাগে। একটি পরিপূর্ণতা এবং কর্মব্যস্ততার শেষে মানুষের যখন বিশ্রামের অবসর হয় তখন একদিন সবকিছুই ফেলে চলে যেতে হবে সে চিন্তা মনে জাগা অসম্ভব নয়। বাস্তব জীবনে কোনও মৃত্যুর সাক্ষ্য এসময় আমরা পাই না। সুতরাং এ মৃত্যু-চিন্তাকে এক প্রকার মানসিক চিন্তা বলে ধরে নিতে পারি।

এক থেকে একুশ সংখ্যক পর্যন্ত কবিতাগুলো হচ্ছে সুরারোপিত কাব্য-কথা। এখানকার প্রতিটি কবিতাই সুরের সম্মোহনে প্রাণদীপ্ত এবং অর্থবহ। এরপরে বাইশ থেকে নিরানববই সংখ্যক কবিতাগুলো সনেটের অবয়বে গ্রথিত কতকগুলো অনুভূতি। এগার সংখ্যক কবিতায় যে কথাগুলো বলা

হয়েছে সে কথাগুলোই সনেটের আকারে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে বাইশ সংখ্যক কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন *নৈবেদ্য* রচনা করেন তখন ঊনবিংশ শতাব্দী সবেমাত্র শেষ হয়েছে এবং বিংশ শতকের সবেমাত্র সূত্রপাত ঘটছে। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবল পরিবর্তন ঘটছে, উনিশ শতকের রোমান্টিক স্বপ্ন-বিভ্রম বিংশ শতকে আর গ্রাহ্য নয়। নতুন যুগে মানুষের জন্য শক্তির প্রয়োজন, সুদৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন এবং সংকটকে অতিক্রম করবার অধিকারের প্রয়োজন। ভাবোল্লাস এবং রোমান্টিক আশ্লেষের এখন আর প্রয়োজন নেই। নতুন জীবনে যে সাহস এবং অকুতোভয়ের প্রয়োজন বায়ান্ন সংখ্যক সনেটে এর একটি সুন্দর পরিচয় আছে:

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা-'পরে
যাহারা পড়িয়াছিল ভাবাবেশভরে
রসপানে হত জ্ঞান, যাহারা নিয়ত
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত—
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রিদলে
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ! শুধু দীর্ঘ বেলা
তোমারে খেলনা করি করিয়াছে খেলা।

কর্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করছে সংকীর্ণ রুধি দ্বার-বাতায়ন—
তারা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা—
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা!

রবীন্দ্রনাথ বারবার এ কথা বলছেন যে এখন এমন একটি সময় এসেছে যে সময় মানুষের প্রয়োজন শক্তিমত্ততার, বিশ্বাসের এবং কর্মোদ্দীপনার। যারা নৃত্য-গীত-গানে ভাব উন্মাদনায় সময় বিনষ্ট করে সে উচ্ছলতা এবং বিহ্বলতা জীবনকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়। এখন প্রয়োজন সর্ব কর্মে বলীয়ান হওয়া এবং জীবনকে বিস্তৃত করা বিশ্বাসে এবং সত্যের সাহায্যে। তাই কবি বলছেন:

দাও চিত্তে বল
দেখাও সত্যের ছবি কঠিন নির্মল

একই কথা সাতচল্লিশ সংখ্যক সনেটেও অভিব্যক্ত হয়েছে:

আঘাত সংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি

খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

এই যে শক্তি অর্জন, এর প্রয়োজন কার জন্য? কবি সঙ্গেসঙ্গেই উত্তর দিচ্ছেন: এর প্রয়োজন দেশের জন্য। দেশের পরাধীনতা কবিকে পীড়িত করেছে এবং পরাধীনতা এসেছে দুর্বলতার জন্য—যে-দুর্বলতা লোকভয়, রাজভয় এবং মৃত্যুভয় সৃষ্টি করেছে—এই আত্মঅবমাননা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। অধিকারের পদপ্রান্তে নতশিরে যারা দাসত্বকে মেনে নেয় সেই দাসত্বের বন্ধনকে উন্মোচন করে মানুষের মর্যাদায় জাগরিত হওয়ার প্রযোজনের কথা কবি বলেছেন। সকল লজ্জাকে দূর করে অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবার সৎসাহাস সকলের হোক এই প্রার্থনা কবি করছেন। এই একই কথা বিভিন্ন কবিতায় বিচিত্র আক্ষেপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সত্যের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা এবং মিথ্যাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা। একটি সনেটে এই ভাবটি স্পষ্ট হয়েছে:

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়। দুর্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ় নিষ্ঠাভরে।
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মতো—যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে, আবেশে দিবস কাটে তার।
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দিকে। মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে—
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে।

অপমানে নতশির ভয়ে-ভীত জন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।

দেশকে নতুন উজ্জীবন মন্ত্রে জাগ্রত করার প্রবল ভাষণ ষাট ও তেষট্টি সংখ্যক সনেটে আছে। মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা এখানে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে বাঁচবার একমাত্র পথ হচ্ছে মৃত্যুকে অতিক্রম করা। সংকুচিত

না থেকে দীপ্ত তৃপ্ত মুখে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাধনায় লিপ্ত হতে হবে। তবেই মৃত ভারতের জাগরণ সম্ভবপর হবে। কবি বলছেন যে, প্রাচ্যকে নতুন করে জেগে উঠতেই হবে এখন, পাশ্চাত্যের দম্ভ প্রাচ্যের ললাটকে যেন স্পর্শ না করে। বর্তমানে ইউরোপে হিংস্রতা এবং অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হল ইউরোপের ধ্বংসযজ্ঞের প্রস্তুতির মধ্যে। সেই ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা কবি দিয়েছেন নিম্নরূপে:

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

পঁয়ষট্টি সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন স্বার্থের সমাপ্তি হচ্ছে অপঘাতে। মানুষের স্বার্থ যত পূর্ণ হয় ততই সে লোভাতুর হয়, লোভের আগুন ততই তার বেড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য জগৎ এক বিকৃত জাতীয়তাবোধ নির্মাণ করে সংঘাত এবং সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছে। শতাব্দী শেষে পাশ্চাত্যে সংঘাতের রক্তরাগ রেখা দেখা দিচ্ছে। কবির বিবেচনায় এটা একটি দারুন প্রলয়দীপ্তি। একটি স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। এই বীভৎস ভয়ঙ্করের মধ্যে শক্তি সাধনা কাম্য নয়, কাম্য হচ্ছে শান্তি, করুণা এবং মমতা। এই শান্তি, করুণা এবং মমতা পাওয়া যাবে পূর্ব সিন্ধুতীরে অর্থাৎ ভারতবর্ষে। কবি প্রাচীন ভারতের সামগান এবং শান্তির স্তোত্রকে নতুন করে জাগ্রত করতে চাচ্ছেন। প্রাচীন ভারতে যে প্রশান্তি ছিল, মানবের কল্যাণের জন্য মৈত্রীর যে ঘোষণা ছিল সে ঘোষণাকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপ্ত শিখা
করিয়া লজ্জিত।

অন্য একটি কবিতায় বলছেন পরাধীন এ দেশ শুধু নির্যাতিত হয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করেনি, সত্য বলবার যে অহঙ্কার তার ছিল সে সত্য থেকে তারা দূরে সরে এসেছে। তখন প্রয়োজন সত্যকে গ্রহণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া। বিধাতার কাছে

আবেদন জানাচ্ছেন যে-ব্যক্তি অন্যায় করে এবং যে-ব্যক্তি অন্যায় সহ্য করে উভয়ই সমভাবে দোষী। বিধাতা যেন উভয়কেই দণ্ডীভূত করেন। কবি আরও বলছেন তিনি সেই অমৃতকে পেতে চান এবং সেই আনন্দকে পেতে চান যা তুচ্ছ আচারের মধ্যে আবদ্ধ নয়। চিত্তকে ভয় শূন্য রাখতে হবে, শির উন্নত রাখতে হবে এবং জ্ঞানকে মুক্ত রাখতে হবে, তাহলেই মানুষ নিজের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারবে। ভারতবর্ষ সেই স্বর্গে জাগরিত হোক যেখানে বিচার আছে, বিশ্বাস আছে এবং সত্য আছে। কবির ভাষায়:

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

কবিতার সত্য কি? কবিতা আদৌ কি কোন সত্য প্রকাশ করে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব কঠিন। কবিতা কখনও বাস্তব চিন্তায় অধীর, আবার কখনও পরানুখ। এক কথায় কবিতা কখন যে কি বলবে তা বলা কঠিন। তবু একটি সত্য অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে কবির মন। এই মন কখন কি যে ভাববে তা বলা কঠিন। এই মনের নিগূঢ়তম অভিব্যক্তি কবিতা। *নৈবেদ্য*-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি নিগূঢ় অভিব্যক্তি রূপ পেয়েছে। তিনি যেমন সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন পরম বিধাতার কাছে তেমনি আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে নতুন অভিজ্ঞতা এবং অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন তাঁর দেশ এবং দেশেবাসীর জন্য। উপরের উদ্ধৃতিতে আমরা সেই রকম একটি আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছার অভিব্যক্তি দেখি। আচার এবং সংস্কারমুক্ত হয়ে দুর্যোগকে গ্রহণ করে পৌরুষকে উদ্দীপ্ত রাখার কথা তিনি এখানে বলেছেন।

নৈবেদ্য-এর তেয়াত্তর এবং চুয়াত্তর সংখ্যক কবিতা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার উপর। প্রথম কবিতাটিতে বাংলার ভূ-প্রকৃতির মাধুর্য এবং শান্তির মোহমুগ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশে নির্জন নদীতট আছে, মুক্ত নীলাম্বর আছে, নদীর তরল কল্লোল আছে, তরুচ্ছায়ার স্নেহ আছে এবং পল্লী গৃহের স্নিগ্ধতা আছে। এ কারণে কবি দেশের সর্ববিধ কার্যে আত্ম-নিয়োগ করবেন বলছেন, যদি কখনও সে আহ্বান আসে। দ্বিতীয় কবিতায় তিনি বলছেন যে, তিনি যেখানেই যান না কেন মাতৃভূমির সঙ্গে যোগসূত্র তাঁর চিরকালই থাকবে, যে দেশে তার মাতৃভাষা উচ্চারিত হয় না, সে দেশেও

যদি তিনি থাকেন সেখানেও মাতৃভাষার কলগুঞ্জন তিনি অনুভব করতে থাকবেন। এই কবিতা দুটি অনিবার্যভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র অনেকগুলো কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। মধুসূদনের কবিতাগুলো অধিকতর সততাসিদ্ধ এবং প্রগাঢ়ভাবে আন্তরিক এই অর্থে যে মধুসূদন তাঁর কবিতাবলী রচনার সময় বিদেশে অবস্থান করছিলেন এবং মাতৃভূমির কথা প্রবল আকুলতায় ভাবছিলেন।

নৈবেদ্য-এর কয়েকটি কবিতা ভারতবর্ষের উপর। উনিশ শতকের শেষ পর্বের শেষ পর্যায়ে এসে এবং বিংশ শতকের আরম্ভের লগ্নে ভারতবাসীরা সবেমাত্র যখন স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সচেতন হয়েছে সেই সময়কার লেখা এ কবিতাগুলো। তিনি বলছেন শক্তিমদমত্ত এবং ধনদীপ্ত বণিক সম্প্রদায়কে দেখে ভয়ে ভীত হবার কিছু নেই। তাদের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্য ভারতবাসীর রয়েছে। সে ঐশ্বর্য হচ্ছে সরলতা এবং শান্তির ঐশ্বর্য। ধনৈশ্বর্যের সম্মুখে অভিভূত না হয়ে স্বাধীন আশার পরিচর্যা করাই মঙ্গলজনক। অতীতে ভারতের বহু নৃপতি মুকুটদণ্ড এবং সিংহাসন ত্যাগ করে দরিদ্র বেশ ধারণ করেছেন, যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করার শিক্ষা ভারতবর্ষ শিখিয়েছে, কর্ম করবার অধিকার দিয়েছে এবং ফললাভে নিস্পৃহ থাকার কথা বলেছে, আত্মার যে আগাধ সম্পদ আছে সেই সম্পদের সামনে পার্থিব সম্পদের কোন মূল্যই নেই। অন্তরের সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি বলেই আমরা আজ লজ্জানত এবং আমরা শুধু জপমাত্র নিয়ে অর্থহীন অভ্যস্ত আচারে সময় বিনষ্ট করেছি। সেই কারণে কবির সর্বশেষ আবেদন বিধাতার কাছে, যেন বিধাতা তাঁর ক্ষীণতা দূর করেন, শক্তি প্রদান করেন, দুঃখকে উপেক্ষার শক্তি দান করেন। প্রত্যহের তুচ্ছতার উর্ধ্বে যেন স্থান পেতে পারি সেই ক্ষমতা যেন বিধাতা দেন। কবির সর্বশেষ আবেদনটি অত্যন্ত সুন্দর:

যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী
এক বিশ্বাস বহে যেন চিতে লাগিয়া।
যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
দুখ পশে যবে মর্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে,
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।
শত বিশ্বাস ভেঙ্গে যদি যায় প্রাণে
এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।

নৈবেদ্য সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ক. *ক্ষণিকার*-র মত *নৈবেদ্য* একটি অখণ্ড এবং পূর্ণাবয়র কাব্য। এখানে বিভিন্ন ধরনের কবিতার মিশ্রন নেই।

খ. *নৈবেদ্য* ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, আত্মনিবেদন এবং বিনয়ের কাব্য। দুঃখকে বরণ করে নির্যাতনকে উপেক্ষা করে, সংকটে বিপর্যস্ত না হয়ে সত্যকে গ্রহণ করার কথা কবি এ কাব্যে বারবার বলেছেন।

গ. একটি শতাব্দী যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং অন্য একটি শতাব্দীর যে মুহূর্তে সূত্রপাত, *নৈবেদ্য*-এর কবিতাগুলো সেই মুহূর্তের। ইউরোপের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ তখন ক্ষুব্ধতায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বিভিন্ন দেশ সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছে, ন্যায়-নীতি বিবর্জিত হবার মুখে, সেই সংকটকালে কবি মানুষের মুক্তির জন্য সদাচার ও সৎচিন্তার কথা বলেছেন। বাংলাকাব্যে এই প্রথম বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত সুস্পষ্টভাবে গৃহীত হল।

ঘ. *নৈবেদ্য*-গ্রন্থে প্রথম কবি সুস্পষ্টভাবে দেশের পরাজিত অবস্থার জন্য ক্রন্দন করছেন এবং দর্পিত পাশ্চাত্যের বণিকদের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করছেন।

ঙ. *নৈবেদ্য*-এর শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত সরল এবং সুস্পষ্ট। উপমা-রূপকের আচ্ছন্নতা নেই, অত্যন্ত সরলভাবে তিনি তার বক্তব্য উচ্চারণ করেছেন। পরবর্তীতে *গীতাঞ্জলি, গীতালি* এবং *খেয়া*-তে এর আরও পরিপূর্ণতা দেখব।

স্মরণ

স্মরণ নামক কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুতে রচিত। বাংলা ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী দেহত্যাগ করেন। তার স্মৃতির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলো রচনা করেন তার অধিকাংশই নবপর্যায় *বঙ্গ-দর্শন*-এর ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত *কাব্যগ্রন্থাবলী*-তে সংকলিত হয়। *স্মরণ* কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অনুসরণ করা বিশেষভাবে কর্তব্য:

ক. যখন বিয়ে হয় তখন রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর বয়স এগার বছর। এই অল্প বয়সে কোন বালিকার প্রেমের স্ফুরণ ঘটবার কথা নয়

সুতরাং প্রেমের যে স্পর্শকাতরতা, মধুরতা এবং আবেগগত হিল্লোল সেগুলোর কোনটাই বালিকা-বধূর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করতে পারেননি।

খ. একটি বিবাহ-উৎসব শেষে একটি সংসারে আনন্দের উচ্ছলতা জাগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা নিরানন্দে পরিণত হয়েছিল। বিবাহকর্মে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত থাকতে পারেননি, তিনি তখন নৌকোপথে জমিদারী দেখছিলেন। ২৪শে অগ্রহায়ণ যখন কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ঐদিনই শিলাইদহের জমিদারীতে মহর্ষির জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। সুতরাং বিবাহের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বিষাদের ছায়া পড়েছিল।

গ. এ বিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন রূপ ছায়াপাত করেনি এবং কোনরূপে আবেগ উচ্ছলতার জন্ম দেয়নি। তার প্রমাণ, বিবাহ একজনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতি*-তে অতি সংক্ষেপে এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ করেন—'১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।' কোন রকম আবেগ উচ্ছলতা নেই, একটি নির্লিপ্ত সংবাদরূপে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

ঘ. বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশে জমিদারীর কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য পিতার নিকট থেকে নির্দেশিত হন। সুতরাং বিবাহের উৎসব জমিদারীর কার্যবিধিতেই পর্যবসিত হল।

ঙ. রবীন্দ্রনাথের মনে জীবনসঙ্গিনী সম্পর্কে যে সব কল্পনা বা স্বপ্ন ছিল এই বিবাহের দ্বারা সেগুলো সফল হয়নি। তিনি যাকে বধূরূপে গ্রহণ করেছিলেন সে ছিল বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহের দশ/এগার বছরের বালিকা।

চ. রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আজীবন এই কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিদ্যমান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের অব্যবহিত পরেই কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। এই বেদনা-বিধুর স্মৃতি চিরকাল রবীন্দ্রনাথ বহন করেছেন। বহু কবিতা এবং গান কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে তিনি লিখেছেন। তাঁর জীবনে প্রণয়াবেগের যে অভিব্যক্তি তা কাদম্বরী দেবীকে নিয়েই সম্পূর্ণতা

পেয়েছিল। সুতরাং বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে আবেগ প্রকাশের সুযোগ এবং স্পৃহা রবীন্দ্রনাথের কখনই হয়নি।

ছ. স্ত্রীর মৃত্যুতে তাৎক্ষণিকভাবে যে কবিতাগুলো লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের নিরাসক্তি আছে, কোন প্রকার আবেগের উদ্বেলতা নেই।

স্মরণ -এর কবিতাগুলো মর্মান্তিকরূপে নিরুত্তাপ। কবিতাগুলোর গতিভঙ্গি অত্যন্ত আড়ষ্ট। এ যেন একান্ত লিখতে হবে বলেই লেখা। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো থেকে যে-কোন সর্তক পাঠক অনুভব করতে পারবেন যে কবিতাগুলো কত অসতর্কবদ্ধ এবং শিথিল:

১. সে যখন বেঁচে ছিল গো, তখন
যা দিয়েছে বারবার
তার প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর।

২. তখন নিশীথরাত্রি; গেলে ঘর হতে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায় বারতা।

৩. আমার ঘরেতে আর নাই, নাই সে যে নাই—
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।

৪. যত দিন কাছে ছিলে বলো কী উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে?
ছিলে তুমি আপনার কর্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।

৫. দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহযুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলনা ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।

৬. জাগো রে জাগো রে চিত্ত, জাগো রে,
জোয়ার এসেছে অশ্রু সাগরে।
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জনগানে জাগো রে।
তরী তোর নাচে অশ্রু সাগরে।

শিশু

শিশু কাব্যগ্রন্থটি *স্মরণ* -এর পরিপূরক গ্রন্থ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ *স্মরণ* রচনা করেন এবং মাতৃহীনা পুত্র-কন্যাদের পরিতোষের জন্য *শিশু*-র অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন।

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তমভাগরূপে *শিশু* ১ ৩১০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। স্ত্রীর পরলোকগমনের পর কবি পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকা এবং কনিষ্ঠ পুত্র সৌমিন্দ্রনাথকে নিয়ে আলমোড়া গিয়েছিলেন। এখানেই *শিশু*-র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়। শিশু-বিষয়ক অন্যান্য কবিতা যেগুলো রবীন্দ্রনাথ পূর্বে বিভিন্ন সময়ে লিখেছিলেন সেগুলোর সঙ্গে আলমোড়ায় রচিত কবিতাগুলো যুক্ত করে *শিশু* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শিশু-বিষয়ক অথবা শিশুদের তৃপ্তিবিধানের জন্য অনেক কবিতাই রবীন্দ্রনাথ অতীতে লিখেছেন, সেগুলো আমাদের আলোচ্য রচনাবলীর *শিশু* কাব্যগ্রন্থে নেই, যেমন 'বিম্ববতী'—যা *সোনার তরী*-তে প্রকাশিত হয়েছে, 'অভিমানিনী', 'স্নেহময়ী', 'ঘুম'—*ছবি ও গানে*, 'মঙ্গল গীত'—*কড়ি ও কোমলে*', 'সুখ-দুঃখ'—*ক্ষণিকা*-তে, 'সাধ'—*প্রভাতসঙ্গীত*-এ এবং 'স্নেহ স্মৃতি'—*চিত্রা*-য় মুদ্রিত হয়েছে।

শিশু কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ যে কবিতাটি প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে শিশুরা যে মরণজয়ী একথাটি অভিব্যক্ত হয়েছে। শিশুরা খেলা করে এবং পৃথিবীর তটপ্রান্তে আনন্দ নির্মাণ করে। পৃথিবীতে ধ্বংস আসে, ভয়ংকর আসে কিন্তু শিশুদের খেলা বন্ধ হয় না। আমাদের তাপিত জগতে শিশুরাই তো মরণ-হরণ। কবির ভাষায়:

জগৎ- পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে;
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

শিশু-র প্রথম কবিতার নাম 'জন্ম কথা'। কবিতাটি বড়দের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে পড়ে। একটি শিশু কি করে এলো তার উত্তরে কবি বলছেন যে, একটি শিশু তার মাতার ইচ্ছার পরিপূর্ণতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। শিশু হচ্ছে মাতার ইচ্ছার এবং আনন্দের অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ।

কথাটি তত্ত্বমূলক এবং কোন শিশুর বোধের আয়ত্ত নয়। তবুও এই কবিতার মধ্য দিয়ে চিরকালীন একটি জীবনসত্যকে রূপ দিয়েছেন কবি:

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ স্রোতে
নতুন হয়ে আমার বুকে বিলসি।।

শিশু-র কবিতাগুলো মমতা ও করুণায় মণ্ডিত। নানা বিচিত্র উপায়ে শিশুদের সঙ্গী হিসেবে কবি সহজ ভাষায় তার হৃদয়ের আগ্রহ অনুপম মাধুর্যে প্রকাশ করেছেন। পিতামাতার আনন্দ হচ্ছে শিশুদের উৎফুল্ল রাখা এবং নিজেদের জীবনের মধ্যেও একটি শান্ত আনন্দকে ধারণ করা। *শিশু* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রে এ কথাগুলো সত্য। শিশুদের অস্ফুট হাসি, আধো আধো বলা, কম্পিত চরণপাত, ঘুমন্ত অবস্থা, মধুর চাতুরী— এগুলো নিয়ে শিশুর রাজ্য। এই রাজ্যের যে অহমিকা, নতুন বিস্ময় এবং আকাঙ্ক্ষা তার বিচিত্র প্রতিবেদন আমরা *শিশু* কাব্যগ্রন্থে পাই।

রবীন্দ্রনাথ শিশুর মনের মধ্যে প্রবেশ করে শিশুকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর দিকে একটি শিশু কিভাবে দৃষ্টিপাত করে তা আমরা জানিনা, যদি জানতাম তবে কতই না কল্যাণ হত, শিশুদের রাজ্যে ক্রোধ নেই, সংঘর্ষ নেই, একটি অনাবিল তৃপ্তি এবং শান্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ এটাকে বলছেন 'চিন্তাহীন এবং মৃত্যুহীন গল্পলোক'। শিশুদের কার্যবিধি লক্ষ করে তাদের নানাবিধ কর্মতৎপরতায় কবি মুগ্ধ হচ্ছেন। তিনি অভিনিবেশ সহকারে শিশুদের জীবনধারাকে বুঝবার চেষ্টা করছেন। শিশুদের অবাস্তব সমস্ত খেলা, হৃদয়ের নিভৃতে একটি বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যে তিনি টেনে এনেছেন।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' এবং 'সাত ভাই চম্পা' এই কবিতা দুটি অত্যন্ত মধুর এবং অনবদ্য। পল্লীগানের মধ্যে যে গানের কলিটি আছে তাকে অবলম্বন করে বৃষ্টির লীলাখেলাকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কবিতার মধ্য দিয়ে পল্লীগানের একটি মধুর ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। নীচের উদ্ধৃতি থেকে লোকগীতির আনন্দের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

ওপারেতে বিষ্টি এল
ঝাপসা গাছপালা।
এপ্যারেতে মেঘের মাথায়
একশ মানিক জ্বালা।

বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলে বেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।।

শিশু কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যায়:

ক. *শিশু* কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ শিশুর মনোজগৎকে উদঘাটন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। শিশু যে জগতে বাস করে সে জগতের স্বরূপ কি তা জানতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে যে শিশু একটি শান্তি এবং পরিচ্ছন্নতার গল্পলোকে বাস করে।

খ. *শিশু* কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পিতৃস্নেহের একটি বিমুগ্ধ উন্মোচন ঘটেছে। তিনি তাঁর মমতাকে অপরূপ আনন্দে শব্দে সমর্পণ করেছেন।

গ. শিশু -বিষয়ক কবিতা রবীন্দ্রনাথ আজীবন অনেক লিখেছেন। এই লেখাগুলোর মধ্য দিয়েই আমরা প্রমাণ পাই যে রবীন্দ্রনাথ শান্তি এবং পরিচ্ছন্নতাকে কামনা করেন।

ঘ. *শিশু*-র কবিতাগুলো সহজ এবং সরল। এই সহজতার মধ্যে একটি সত্য স্পষ্ট করেছে যে এই মৃত্যুময় জগতে শিশুরা মৃত্যুহীন।

ঙ. যে অপূর্ণতা *স্মরণ* কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে তা দূর হয়েছে *স্মরণ*-এর পরিপূরক গ্রন্থ *শিশু*-তে।